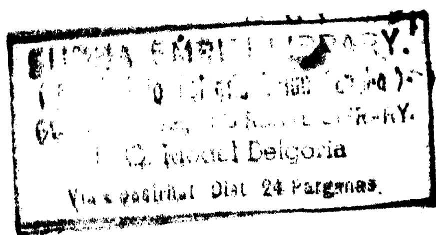
কাঞ্চনজ সিরিজের



শ্রীবুদ্ধদেব বসু

প্রকাশক—শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব-সাহিত্য-কুটীর
২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা



পুনর্মুদ্রণ—১৩৫০
দাম—বারো আনা

প্রিণ্টার—এস্. সি. মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা



'…ঘরের ভিতরে মুখ বাড়াতেই যে-দৃশ্য চোখে পড়লো !—'

ভূতের মতো অদ্ভুত

এক

নাম ব্রডওয়ে হোটেল, কিন্তু আসলে বৌবাজারে কেরানি ও বেকারবাবুদের একটি মেস। এই মেসে শীতের রবিবারের এক সকালবেলায় এ-গল্পের যবনিকা তোলা গেলো।

চাকুরেদের পক্ষে—বিশেষত কলকাতার কেরানিদের পক্ষে—রবিবার দিনটি সত্যিই স্বর্গীয়। এই তো নরহরিবাবু, যিনি অন্য সব দিন এই শীতেও ভোর না-হ'তে ওঠেন, তারপর শ্যামবাজারে ছেলে-পড়ানো চুকিয়ে, কোনোরকমে নাওয়া-খাওয়া সেরে ন'টা না-বাজতেই আপিশে ছোটেন, তিনি আজ বেলা আটটাতেও লেপের তলায় পাশ ফিরছেন। এইমাত্র তাঁর ঘুম ভাঙলো। গোটা দুই হাই তুলে তিনি অস্ফুটস্বরে বললেন, 'দুর্গা, দুর্গা!' তারপর হাঁক দিলেন, 'দুর্গা!'

শেষের ডাকটি জগৎমাতাকে লক্ষ্য ক'রে নয়। দুর্গা মেসের এক চাকর। এক ডাকে তার দেখা পাওয়া গেলো [illegible] এখন নরহরিবাবু গলা চড়িয়ে আবার ডাকলেন, 'দুর্গা—

ভূতের মতো অদ্ভুত

গলার জোর আছে নরহরিবাবুর, কেরানি না-হ'য়ে কলকাতার কলেজে প্রোফেসর হ'লে তাঁকে মানাতো। একতলার সিঁড়ির কাছে কলতলায় দুর্গা চায়ের পেয়ালা ধুচ্ছিলো, তার কানে সে-ডাক পৌঁছলো। সে তাড়াতাড়ি হাতের কাজ সেরে একটা চায়ের কেৎলি নিয়ে বেরিয়ে গেলো, মিনিট পাঁচেক পরে কেৎলিতে চা, একটা প্লেটে দু'খানা টোস্ট আর হাতে একটা চায়ের পেয়ালা ঝুলিয়ে উঠে এলো তেতলায় নরহরিবাবুর কাছে।

তাকে দেখেই নরহরিবাবু চ'টে উঠে বললেন, 'হতভাগা, তোকে এতক্ষণ ধ'রে ডাকছি, কোথায় থাকিস—'

দুর্গা বললে, 'আপনার চা-টা একেবারে নিয়েই এলুম।'

নরহরিবাবু তক্ষুনি জল হ'য়ে গিয়ে বললেন, 'বাঃ, বেশ। তোর বেশ বুদ্ধি আছে, দুর্গা। জীবনে তোর উন্নতি হবে।'

দুর্গা বললে, 'আমি তো জানি আপনি রবিবারে সকালে উঠেই প্রথমে এক পেয়ালা চা খান, তাই আপনার ডাক শুনে উপরে না এসে একেবারে চা আনতেই চ'লে গেলুম।'

চা নরহরিবাবু রোজই সকালে খান, তবে অন্যান্য দিন এমন আরাম ক'রে খাওয়া হয় না, ট্যুশনি করতে যাবার পথে দোকানে ঢুকে তাড়াহুড়ো ক'রে খেয়ে নেন। আজ আরাম করবার দিন, আজ সব ব্যবস্থাই অন্যরকম।

'বেশ, বেশ। চা-টা ঢেলে দাও তো বাবা। টোস্টও এনেছিস দেখছি। খুব ভালো। দুর্গা, তুই লেখাপড়া জানিস?'

তক্তাপোষের পাশে টেবিলের উপর চায়ের পেয়ালাটি রেখে দুর্গা বললে, 'অল্প-অল্প জানি।'

ভূতের মতো অদ্ভুত

'পাশ-টাশ করলে তোর ভালো চাকরি হ'তো, দুর্গা ?'

'আজকালকার দিনে তা কি জোর ক'রে বলা যায় ?'

লেপের তলায় আধো শোয়া অবস্থায় চা খেতে-খেতে নরহরিবাবু বললেন, 'তা যা বলেছিস। কত বি.এ., এম.এ. ফ্যা-ফ্যা ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবু তো গতর খাটাতে পারিস ব'লে খেতে পাচ্ছিস। বড্ড খাটুনি মেসে, না রে ?'

'তা খাটতেই তো এসেছি।'

নরহরিবাবু হঠাৎ তাঁর বালিশের তলায় হাত দিয়ে একটি আনি বের ক'রে দুর্গার হাতে দিয়ে বললেন, 'নে এটা। কিছু কিনে-টিনে খাস। এখানে আমাদেরই যা খাওয়ার ব্যবস্থা, তোরা যা খাস ভাবতেই ভয় করে।'

দুর্গা আনিটি তার জামার পকেটে রেখে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো। নরহরিবাবু প্রায়ই তাকে এ-রকম দু'চার পয়সা দিয়ে থাকেন। মানুষটি তিনি একটু শৌখিন গোছের। বোধ হয় তাঁর রোজগারও ভালোই, তেতলায় আস্ত একটা ঘর নিয়ে থাকেন। তার উপর হৃদয়টাও তাঁর কোমল। মেসে যখনই যার দরকার, দু'চার টাকা ধার দিতে পরোয়া করেন না, সে-টাকা সব সময়ই যে ফেরৎ আসে তাও নয়। বেকার ছেলেদের চাকরির খোঁজ-খবর দেয়া, তাদের অ্যাপ্লিকেশন নিজের আপিশ থেকে টাইপ করিয়ে আনানো—এ-সব তিনি হামেশাই ক'রে থাকেন। এ-সব কারণে মেসে সকলেই তাঁকে ভালোবাসে, ম্যানেজর থেকে শুরু ক'রে সকলেরই তিনি হরি-দা।

নরহরিবাবু বললেন, 'একখানা খবরের কাগজও যে চাই, দুর্গা। তা না-হ'লে চা জমে না।'

ভূতের মতো অদ্ভুত

'নিয়ে আসবো ?'

'এক্ষুনি আবার এতগুলো সিঁড়ি ভাঙবি ?'

'দিনরাতই সিঁড়ি ভাঙছি বাবু, ওতে আমাদের কিছু হয় না।'

দুর্গাকে নরহরিবাবু যেন বিশেষ-একটু স্নেহের চোখেই ছাখেন। তার কারণও আছে। দুর্গা ভারি ছেলেমানুষ, আঠারো উনিশ মতো বয়েস। দেখতেও সুন্দর, হাত-পা তকতকে পরিষ্কার, দেখে ভদ্রলোকের ছেলে মনে হয়। কথাবার্ত্তাও মার্জিত। এই মেসে সে নতুন এসেছে, পুরো একমাসও হয়নি। মেসের চাকরদের গালি-গালাজ এমনকি মার-ধোর প্রায়ই সহ্য করতে হয় আর খাটতে হয় ভূতের মতো। দুর্গাকে দেখে মনে হয়নি সে কাজ চালাতে পারবে। ম্যানেজরবাবুও বোধ হয় তার সুন্দর মুখ দেখেই দয়া ক'রে তাকে বাহাল করেছিলেন। বাবুদের ফাই-ফরমাশ খাটবার জন্যে তাকে রাখা হয়েছে। মেসের সব বাবুরাই তাকে যেন একটু-আধটু দয়া করেন—মাঝে-মাঝে এক-আধটু বকুনি দিলেও এ-পর্য্যন্ত চড়-চাপড় তার পিঠে পড়েনি। তবে এও বলতে হয় যে কাজকর্ম দুর্গা চালাচ্ছে ভালোই—শুধু তার সুন্দর মুখ দেখে নয়, তার কাজেও সকলে তার উপর খুশি।

নরহরিবাবু বালিশের তলা থেকে আর একটা আনি বের ক'রে দিয়ে বললেন, 'তাহ'লে যা একখানা খবরের কাগজ নিয়ে আয়।'

'আনন্দবাজার ?'

'না, না, বাংলা কাগজ আমি পড়িনে। জানিস, বিশ বছর আগে বি.এ. ফেল করেছিলুম, সুরেন বাঁড়ুয্যের বক্তৃতা এখনো

আমার মগজে ঘুরছে। অমৃতবাজার আনবি। আর শোন, চারতলার বাবুকে একবার ডেকে দিবি—বলবি আমি তাঁকে তাস খেলতে ডেকেছি।'

প্রায় প্রতি রবিবারেই নরহরিবাবুর ঘরে তাসের আড্ডা বসে। দুর্গা বেরিয়ে যাবার সঙ্গে-সঙ্গেই সরোজ ঘরে ঢুকে বললে, 'কী দাদা, আজ খেলা-টেলা হবে না ?'

'হবে, হবে, বোসো। এই তো ঘুম থেকে উঠলুম। তুমি দেখছি এই সকালেই একেবারে ফিট-ফাট বাবু সেজেছো। বেরুচ্ছো নাকি কোথাও ?'

'আর বলেন কেন—আজ আপিশের বড়োবাবুর মেয়ের বিয়ে। দশটা থেকেই হাজিরা দিতে হবে। ভাবছি তার আগে দু'পিঠ খেলে যাই।'

'বেশ, লোকজন ডেকে আনো। আমি ততক্ষণ হাত-মুখ ধুয়ে আসি', ব'লে নরহরিবাবু লেপের তলা থেকে উঠে পড়লেন। বাথরুমের দিকে যেতে-যেতে বললেন, 'গোবিন্দবাবুকেও খবর পাঠিয়েছি।'

'ঐ বুড়োটাকে আবার কেন দাদা ?'

'বুড়ো তো আমিও।'

'হ্যাঁঃ, রেখে দাও—তোমার পঁয়তাল্লিশ হ'লেই খুব বেশি। সত্যি, হরি-দা, ঐ একচোখো গোবিন্দটাকে দু'চক্ষে দেখতে পারিনে। ও এলে আড্ডাই মাটি হয়।'

'তোরা সকলে মিলে তাঁকে বয়কট করেছিস ব'লেই আমি মাঝে-মাঝে ওঁকে ডেকে পাঠাই। তিনি যে কানা সে তো আর ওঁর দোষ নয়, আর উনি যে কিপটে তাও ওঁর স্বভাবেরই দোষ। তাস খেলতে তিনি ভালোবাসেন, খেলেনও ভালো—

এ-অবস্থায় একই মেসে থেকে তাঁকে না-ডাকলে কি ভালো দেখায় ?'

সরোজ রাগে গজগজ করতে-করতে বললে, 'রেখে দাও তোমার ভালো দেখানো ! লোকটাকে এই মেস থেকেই তাড়িয়ে দেয়া উচিত।'

'কী অপরাধে ? তিনি কুচ্ছিৎ আর কিপটে, তাই ব'লে কি মানুষ নন ?'

'মানুষ ? ওকে তুমি মানুষ বলো হরি-দা ! টাকার কুমির— এদিকে আমাদেরই মতো একটা মেসে প'ড়ে আছে—হেঁটো ধুতি আর হাফ-শার্ট পরে, বিড়ি ফোঁকে, মান্ধাতার আমলের একটা তেল-চিটচিটে বালাপোষ জড়িয়ে শীত কাটায়। ওর গায়ে দুর্গন্ধ, ওর দাড়িতে উকুন, ওর কাপড় এত ময়লা যে ওর পাশে বসতে ঘেন্না করে। অন্যের জন্য কিছু না-হয় না-ই করলো, যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও নিজের জন্যেও যে একটা পয়সা খরচ করে না, তুমিই বলো তাকে কি মানুষ বলে !'

নরহরিবাবু মুচকি হেসে বললেন, 'বড্ড চ'টে গেছো দেখছি। ওর কাছে কিছু ধার-টার চাইতে গিয়ে জব্দ হয়েছিলে বুঝি ?'

সরোজ মুখ লাল ক'রে বললে, 'ক্ষেপেছো তুমি ! পাথর ভাঙলে রক্ত বেরোবে, কিন্তু গোবিন্দ চাটুজ্যের আঙুল গ'লে একটি পয়সা পড়বে না তা তো জানো !'

'বড্ড ছেলেমানুষ আছো এখনো, সরোজ। সব মানুষ একরকম নয়, এ-কথা এখনো মেনে নিতে পারো না কেন ? এই যে দুর্গা এসেছে অমৃতবাজার নিয়ে। তুমি ব'সে-ব'সে একটু কাগজটা পড়ো, আমি আসছি। দুর্গা চারতলার বাবুকে বলেছিলি আসতে ?'

'তাঁর এখনো ঘুম ভাঙেনি! দরজা বন্ধ।'

সরোজ ব'লে উঠলো, 'বুড়ো খুব ঘুমুচ্ছে তো আজ! থাক হরি-দা, ওকে তাহ'লে আর ডেকে কাজ নেই।'

এ-কথার কোনো জবাব না দিয়ে নরহরিবাবু হাত-মুখ ধুতে চ'লে গেলেন।



ভূতের মতো অদ্ভুত

দুই

মিনিট দশেকের মধ্যে আরো কয়েকটি ছোকরা সে-ঘরে এসে জড়ো হ'লো। সকলেই তাসের গন্ধে এসেছে; চারজন খেলবে—বাকি ক'জন দেখবে ও উৎসাহ দেবে, আবার খানিক পরে তারা বসবে অন্যেরা দেখবে। এইরকমই হয় প্রায় রবিবারে।

ভুগা নরহরিবাবুর বিছানা ঠিকঠাক ক'রে সুজনি দিয়ে ঢেকে দিয়ে ঘর থেকে চ'লে গেলো, তখন সেই বিছানার উপরেই গুলজার হ'য়ে বসলো সবাই।

নরেশ আলোয়ান মুড়ি দিয়ে আরাম ক'রে ব'সে বললে, 'আঃ!' ঐ একটি কথাতেই যেন ছ'দিনের খাটুনির পরে পুরো একটি দিনের বিশ্রামের আনন্দ ফুটে উঠলো।

মনোহর বললে, 'বেশ কনকনে শীতটি পড়েছে আজ। এমন দিনেই তো আড্ডা জমে। শুধু-শুধু তাস নয় ভাই, আজ হরি-দাকে ব'লে চায়ের ব্যবস্থা করা যাক্—'

—'আর সেই সঙ্গে গরম শিঙাড়া,' বললে সরোজ। 'জানো তোমরা, সে-ব্যবস্থাও করেছেন হরি-দা।'

ফর্শা বেঁটে মতো একটি ছেলে এক কোণে ব'সে তাস নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলো, সে ব'লে উঠলো, 'তা হরি-দা তো আড্ডা বসলেই চা খাওয়ান, আমাদেরই একদিন বিনিময়ে কিছু করা উচিত।'

ভূতের মতো অদ্ভুত

'আরে শুধু কি চা—রীতিমতো ভোজ, ফীস্টি !'

নরেশ আর মনোহর একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো, 'হুরে ! হুরে !'

সরোজ বলতে লাগলো, 'বিরাট ভোজ দিচ্ছেন শ্রীগোবিন্দ-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় !'

ঐ নামটা শোনামাত্র সকলে একসঙ্গে হেসে উঠলো।

সরোজ বললে, 'হরি-দা আজ আবার ঐ বুড়োটাকে ডেকেছেন। কী কাণ্ড ছ্যাখো দেখি তোমরা। তা আমিও মনে-মনে ভেবে রেখেছি আজ বুড়োর কাছে খাওয়া আদায় করবো তবে ছাড়বো।'

ফর্শা ছেলেটি ব'লে উঠলো, 'গোবিন্দ বুড়ো খাওয়াবে ! তাহ'লেই হয়েছে !'

সঙ্গে-সঙ্গে আবার হাসির হররা।

হাসি থামলে পরে মনোহর বললে, 'ভালো করলে না, সরোজ, ঐ সক্কালবেলা বিটকেল বুড়োটার নাম ক'রে। কপালে কী আছে কে জানে।'

'আজ খাওয়া জোটে নাকি ছ্যাখো,' বললে নরেশ।

সরোজ বললে, 'না, না, আমি যা প্ল্যান করেছি করাই চাই। এমন চেপে ধরবো বুড়োকে যে এ-আড্ডায় তাস খেলতে আর অন্তত আসবে না। তোমরা সব আছো তো আমার সঙ্গে ?'

নরেশ বললে, 'হ্যাঁঃ, তুমি কি ভেবেছো ওর সঙ্গে আমরা পেরে উঠবো। ওর কি এক ফোঁটা চক্ষুলজ্জা আছে !'

ফর্শা ছেলেটি ব'লে উঠলো, 'তাছাড়া একদিন জোর ক'রে খাওয়া আদায় ক'রে লাভই বা কী !'

সরোজ কৌতূহলী চোখে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বললে, 'তবে? তোমার মতটা কী শোনা যাক, আনন্দ।'

আনন্দ বয়সে ওদের সবার ছোটো, তাকে ছেলেমানুষ বলা যায়। বেকার অবস্থায় আছে এই মেসে, চাকরির চেষ্টা করছে। চাকরি হবার কোনো আশাই দেখা যাচ্ছে না, মেসের দেনা দু'মাস বাকি। অবস্থা তার সত্যি খুব খারাপ, পরনে ময়লা কাপড়, শীতেও একটা র‍্যাপার গায়ে নেই, নিচে একটা শার্ট তার উপরে একটা খদ্দরের পাঞ্জাবি পরেছে, সব সুদ্ধু এই দুটোই জামা তার। কোথা থেকে নানারকম বই জোগাড় ক'রে এনে গোগ্রাসে পড়ে সে, আর সুযোগ পেলেই খুব চড়া ক্যানকেনে গলায় এমন সব বক্তৃতা করে যা শুনে মেসবাসীদের তাক লেগে যায়। কেউ তাকে বলে পাগল, কেউ বলে ইডিয়ট, কেউ বা এমনও সন্দেহ করে যে স্বদেশিওয়ালাদের সঙ্গে কোনো গভীর ষড়যন্ত্রে সে লিপ্ত—তাকে মেস থেকে তাড়িয়ে দেয়া হোক এমন প্রস্তাবও কেউ-কেউ এনেছে! কিন্তু মোটের উপর তার কথাবার্তা শুনতে সকলেরই বেশ মজা লাগে, অনেকে ইচ্ছে ক'রেই তাকে বেশ খানিকটা আস্কারা দেয়। আর সত্যি—বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারে সে। তাকে নিয়ে হাসাহাসি করে সকলেই, কিন্তু এ-কথাও অস্বীকার করা যায় না যে ব্রডওয়ে হোটেলে সেই সব চাইতে ভালো বক্তা, আর পড়াশুনোও বোধ হয় তারই সব চেয়ে বেশি।

আনন্দ হাতের তাস ফেলে দিয়ে বলতে লাগলো, 'আমার মত! আমার যা মত তা আপনাদের সকলেরই মনের কথা! শুধু একজন গোবিন্দ চাটুজ্যে তো নয়, এ-রকম দেশ ভ'রে, জগৎ ভ'রে কত আছে। একজন ব'সে আছে রাশি-রাশি টাকা নিয়ে,

সে-সব টাকা হয় ব্যাঙ্কে পচছে নয় নানা বদখেয়ালে উড়ছে, এদিকে হাজার-হাজার লোক খেতে না পেয়ে মরছে কিংবা ঠিক সেটুকু খেতে পাচ্ছে যাতে কোনোরকমে বেঁচে থাকা যায়। মেডিকেল কলেজের সামনে সেদিন দেখলুম একটা ভিখিরি ম'রে প'ড়ে আছে, কলকাতার রাস্তায় প্রায়ই দেখা যায় ডাস্টবিনের এঁটো নিয়ে ভিখিরি আর কুকুরে মারামারি চলেছে। আর আমি, আপনারা—আমরা সবাই—আমাদেরই বা কী অবস্থা! বুকে হাত দিয়ে বলুন, আপনাদের যা আয় তাতে কোনো ভদ্রলোকের চলতে পারে—না চলা উচিত! কলকাতার এই মেসের ফ্যান-মেশানো ডাল আর এক টুকরো ক'রে পচা মাছ খেয়েই কত লোকের সারা জীবন কেটে যায় তা তো জানেন! আর বেকার—তাই বা কত! কত ভালো ছেলে পড়াশুনো পর্যন্ত করতে পারে না, আর বড়োলোকের পেট-মোটা নাদুসনুদুস হোঁৎকা ছেলেগুলো ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি নিয়ে বেরিয়ে আসে। এই আমাকেই দেখুন—আমি জোর ক'রেই বলতে পারি বিজ্ঞানে আমার মাথা খুব ভালো, সুযোগ পেলে হয়তো পৃথিবীতে একটা নাম রাখতে পারতুম। কিন্তু অভাবে আমার কিছুই হ'লো না—একটা কুড়ি টাকার চাকরির জন্য পথে-পথে কুকুরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমার টাকা নেই—আর টাকা আছে ওই কঞ্জুস গোবিন্দ চাটুজ্যের, যার বেঁচে থাকারই কোনো মানে হয় না—' বলতে-বলতে আনন্দর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করতে লাগলো।

'বাঃ, সাবাস ছেলে!' ব'লে উঠলো নরেশ। 'আচ্ছা, বলো তো আনন্দ, এ-সব কথা কি তোমার মুখস্থ করা থাকে?'

'এ-সব আমার প্রাণের কথা', গম্ভীরভাবে বললে আনন্দ।

ভূতের মতো অদ্ভুত

ঐ বেঁটে রোগা ছেলেটির মুখে এ-সব কথা শুনলে সত্যি হাসি পায়, কিন্তু আবার পায়ও না, কথাগুলো বোধ হয় সত্য এ-রকম একটা ধারণা কোথা থেকে এসে জুড়ে বসে।

মনোহর ঠোঁট বাঁকিয়ে বললে, 'তুমি তো দেখছি রীতিমতো একজন পব্লিক স্পীকর—তোমার বক্তৃতাগুলো পার্কে দাঁড়িয়ে দিলেই ভালো হয়, আমরা সামান্য কেরানি, অত বড়ো-বড়ো বিষয়ের চিন্তা করবার সময় আমাদের নেই।'

আনন্দ একটুও দ'মে না-গিয়ে বললে, 'যদি আপনারা সবাই চিন্তা করতেন তাহ'লে তো হ'তোই।'

সরোজ একটু সহানুভূতির স্বরে বললে, 'এ নিয়ে মন-খারাপ ক'রে কী আর করবে—এই তো নিয়ম।'

'এই নিয়ম! কক্‌খনো না। এ-ভাবে পৃথিবী চলতে পারে না। সাম্য চাই—সাম্য।'

সরোজ বললে, 'চাইলেই তো হবে না, ঐ গোবিন্দ চাটুজ্যের দল চিরকালই পথ আগলে দাঁড়িয়ে থাকবে।'

'যারা পথ আগলে দাঁড়িয়ে থাকবে, পথ থেকে তাদের সরিয়ে দিতে হবে', মৃদুস্বরে অথচ খুব জোর দিয়ে এই কথা ক'টি ব'লে আনন্দ আবার তাস নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলো।

মনোহর বললে, 'বাপরে, রক্ত একেবারে টগবগ ক'রে ফুটছে যে। এ-সব ছাড়ো হে ছোকরা, শেষটায় একদিন বিপদে পড়বে—'

নরেশ আলোয়ানটা কাঁধের উপর টেনে দিয়ে বললে, '—আর আমাদের সুদ্ধু জড়াবে।'

আনন্দ চোখ তুলে বললে, 'জানেন, ডস্টয়েভস্কির একটা বইয়ে আছে—'

ভূতের মতো অদ্ভুত

কিন্তু তার কথা শেষ না-হ'তেই ব্যস্তসমস্তভাবে নরহরিবাবু ঘরে এসে ঢুকলেন। তাঁর চেহারা দেখে সবাই চমকে উঠলো —এই মাত্র যেন তিনি ভূত দেখে এলেন।

সরোজ বললে, 'কী হয়েছে হরি-দা, আপনাকে অমন দেখাচ্ছে কেন ?'

'গোবিন্দবাবুকে কে যেন খুন ক'রে গিয়েছে', ব'লে নরহরিবাবু কাঁপতে-কাঁপতে ব'সে পড়লেন।

মনোহর আর নরেশ একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো, 'অ্যাঁ !' আর সরোজের মুখ একদম কাগজের মতো শাদা হ'য়ে গেলো। কিন্তু আনন্দর মুখের কোনো পরিবর্তন দেখা গেলো না, সে মাথা নিচু ক'রে তাস নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলো।



তিন

গোবিন্দ চাটুজ্যে গেলো দশ বছর ধ'রে এই মেসের বাসিন্দা। ইতিমধ্যে মেসের দু'বার হাত বদল হ'লো, একবার নাম বদল হ'লো, কত লোক এলো কত লোক গেলো, কিন্তু গোবিন্দবাবু ঠিকই আছেন। তাঁর জীবনযাপনের প্রণালী সত্যি একটু রহস্যময়। চারতলার যে ঘরটিতে তিনি থাকেন সেটি আসলে ঘর নয়, চিলেকোঠা, অতগুলো সিঁড়ি ভেঙে ঐ ছোট্ট ঘরে মস্ত ছাতের মধ্যে একদম একলা থাকতে সাধারণত কেউই রাজি হয় না—ও-জায়গাটা খালিই প'ড়ে থাকে—কিন্তু গোবিন্দবাবু ঐ চিলতেটুকুই ভাড়া নিলেন মাসিক আড়াই টাকায়। মেসের ম্যানেজর ভাবলে, ও-ঘর তো আর-কেউ ভাড়া নেবে না, ভাড়াটে যে পাওয়া গেছে এই বেশি, সুতরাং আড়াই টাকাই বা মন্দ কী। গোবিন্দবাবুর খাওয়া-খরচ মাসে পাঁচ টাকার বেশি নয়, কারণ তিনি মেসে সকলের সঙ্গে খান না—সকালে একটু ডাল-ভাত আলুসেদ্ধ, আর সন্ধে হবার আগে খান দুই রুটি আর একটু ভাজা—এই তাঁর আহার। চাকর দু'বেলা তাঁর খাবারটা ঘরে দিয়ে আসে। এ ছাড়া আর-কিছু তিনি খান এমন কখনো শোনা যায়নি।

এক কথায় গোবিন্দবাবু একেবারে হাড়-কিপটে; লোকে বলে তাঁর মুখ দেখলে পাপ হয়, নাম নিলে হাঁড়ি ফাটে ইত্যাদি।

মেসে কেউ তাঁর সঙ্গে মেশে না। অবশ্য সেজন্য তাঁর একটুও আপশোষ নেই, কারণ তিনি নিজে ঘোরতর অমিশুক। চার-তলা থেকে তিনি কদাচিৎ নামেন, প্রায় সব সময়ই দরজা বন্ধ ক'রে ঘরের ভিতর ব'সে থাকেন, সন্ধেবেলা ছাতে যখন পায়চারি করেন হঠাৎ দেখলে তাঁকে ভূত ব'লে ভুল হয়। কারণ চেহারাও তাঁর অতিশয় কদাকার। একটা চোখ কানা, লম্বা-লম্বা চুল ঘাড় বেয়ে নেমেছে, নোংরা দাড়ি-গোঁফে মুখ ঢাকা, নাকের উপর একটা মস্ত আঁচিল—ছোটো ছেলেমেয়েরা তাঁকে দেখলে হয়তো ভয়ে চেঁচিয়ে উঠবে। চেহারা দেখে তাঁর বয়েস আন্দাজ করা সম্ভব নয়—চল্লিশও হ'তে পারে, পঞ্চাশ হ'লেও অবাক হবার কিছু নেই।

সবাই বলে গোবিন্দবাবু অনেক টাকার মালিক। সে যে কত টাকা, আর সে-টাকা তাঁর হাতে কেমন ক'রে এলো তা অবশ্য কেউ জানে না। তাঁর কোনো আত্মীয়স্বজন কি বন্ধুবান্ধব আছে ব'লে কখনো শোনা যায়নি, তাঁর কোনো চিঠি আসে না, কেউ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসে না, এদিকে তিনি তো কাজকর্ম কিছুই করেন না, চারতলার ঐ চিলেকোঠা ছেড়ে রাস্তায় নামতেও কেউ তাঁকে ছাখেনি। লোকটি সত্যি রহস্যময়। অনেকে সন্দেহ করে যে টাকাকড়ি তিনি ব্যাঙ্কে না-রেখে নিজের ঘরেই রেখেছেন—আর জীবিত যখ হ'য়ে দিন রাত সেই ঘর পাহারা দিচ্ছেন। এ-রকম সন্দেহ হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ এ-পর্যন্ত কাউকেই তিনি তাঁর ঘরের ভিতর ঢুকতে দেননি—চাকরদের পর্যন্ত না। তাঁর খাবার নিয়ে চাকররা এসে দরজায় ধাক্কা দেয়, তিনি বেরিয়ে এসে খাবারের থালা নিয়ে ভিতরে চ'লে যান, খাওয়া হ'লে নিজেই থালাটি

বাইরে রেখে আবার দরজা বন্ধ করেন। এই নিয়মই বরাবর চ'লে এসেছে। এক মিনিটের জন্য ঘর থেকে বেরুলেও ঘরে তালা দিতে ভোলেন না; ম্যানেজরবাবু কি নরহরিবাবু—এ দু'জন ছাড়া আর কেউই পারতপক্ষে তাঁর মুখদর্শন করতে রাজি নয়—তাঁর কাছে গেলে ভেজানো দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই আলাপ করেন, আর সে-আলাপও দু'চারটে কথাতেই শেষ হয়। তাঁকে দেখলে মেসের সকলেই খুব অস্বস্তি বোধ করতো, লোকটা যেন একটা জ্যান্ত ভূত, এই পৃথিবীর সঙ্গে কোনো সম্পর্কই যেন নেই।

গোবিন্দবাবুর সম্বন্ধে আর-একটা প্রবাদ মেসে প্রচলিত: তিনি নাকি কখনো স্নান করেন না। স্নানের ঘরে তিনি অবশ্য দু'একবার যান, কিন্তু তিনি যে স্নান করেন তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। চুল তাঁর সব সময়েই রুক্ষ, এলোমেলো—বোধ হয় চিরুনিও ব্যবহার করেন না—সমস্ত গা কেমন বিশ্রী নোংরা রকমের। লোকে বলে গচ্ছিত অর্থ ফেলে বাথরুমে দশটা মিনিট কাটাতেও তাঁর প্রাণে সয় না, তাই তিনি স্নান করাই ছেড়েছেন। কেউ বা বলে—তা নয়, পাছে মনের ভুলে একদিন একখানা সাবানই মেখে ফেলেন সেই ভয়ে তিনি জলই ছোঁন না। ম্যানেজরবাবু নাকি বলেন যে তিনি গোবিন্দবাবুকে জিজ্ঞেস ক'রে জেনেছেন যে ভদ্রলোকের কী একটা ব্যামো আছে যেজন্যে তাঁর স্নান করা বারণ। শুনে সবাই বলেছে—হ্যাঁঃ, রেখে দিন ও-সব কথা, ব্যামো না হাতি! এই গরম দেশেও যে স্নান করে না সে কি মানুষ! সে পিশাচ!

সকলের ঘৃণিত এই লোকটার উপরে শুধু নরহরিবাবুই একটু সদয় ছিলেন। লোকটা যতই খারাপ হোক, লোকটা

অসুখী তাতেও সন্দেহ নেই ; নরহরিবাবুর কেমন দয়া হ'তো। তিনি মাঝে-মাঝে চারতলায় গিয়ে গোবিন্দবাবুর সঙ্গে যতটা সম্ভব আলাপ ক'রে আসতেন। এমনকি কখনো-কখনো তাস খেলাতেও ডাকতেন তাঁকে। আশ্চর্যের বিষয় গোবিন্দবাবু তাস খেলার সে-নিমন্ত্রণ রক্ষাও করতেন। জীবনে যার কোনো শখ, কোনো আনন্দ নেই, যাকে জীবিত না-ব'লে মৃত বললেই যেন ঠিক হয়, তারও একটা শখ কোথায় যেন লুকিয়ে ছিলো—সে হচ্ছে তাসখেলার শখ। তাসের নাম শুনলে তিনি চঞ্চল হ'য়ে উঠতেন—এক-একদিন নিজের ঘর ছেড়ে এসে ঘণ্টাখানেক তাস খেলে যেতেন—সকলে অবাক হ'য়ে যেতো। অবশ্য ঐ নির্দিষ্ট এক ঘণ্টা হ'য়ে গেলেই তিনি আস্তে-আস্তে উঠে নিজের ঘরে চ'লে যেতেন। তিনি যাবার সঙ্গে-সঙ্গে সকলেরই যেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়তো। তবে তাস তিনি খেলতেন ওস্তাদের মতোই—যারা তাকে দু'চক্ষে দেখতে পারতো না তারাও মনে-মনে তারিফ করতো। মুখে তাঁর হুঁ-হাঁ ছাড়া কথা ছিলো না—শুধু কোনোদিন কেউ যদি কোনো নাটক দেখে এসে থিয়েটর সম্বন্ধে কথা তুলতো, তিনি মন দিয়ে সে-সব কথা শুনতেন, এমনকি দু'একটা কথাও বলতেন।

একদিন নরহরিবাবু না-ব'লে পারেননি—'চাটুজ্যে মশাই দেখছি থিয়েটরের খোঁজ-খবর একটু রাখেন।'

'হ্যাঁ, এককালে খুব নেশা ছিলো।' গোবিন্দবাবুর কণ্ঠস্বর ছিলো খুব মোটা আর ভারি, অথচ খুব পরিষ্কার—শুনলে চমক লাগে।

এর পর নরহরিবাবু একটা অসম্ভব কথা বলেছিলেন—'চলুন না একদিন সবাই মিলে থিয়েটর দেখে আসি।'

কিন্তু গোবিন্দবাবু গম্ভীরভাবে শুধু মাথা নেড়েছিলেন, কোনো কথা বলেননি।

যার সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না, লোকের কল্পনা তার সম্বন্ধেই উদ্দাম হ'য়ে ওঠে। গোবিন্দবাবুর সম্বন্ধে অনেকগুলি থিওরি মেসে প্রচলিত ছিলো। কেউ বলতো লোকটা খুনি আসামি, ফেরার হ'য়ে আছে; কেউ বা বলতো তিনি নিশ্চয়ই সাধুপুরুষ, দরজা বন্ধ ক'রে যোগ-টোগ করেন; কেউ বা বলতো এঁর স্ত্রী ছেলেমেয়ে সব একসঙ্গে জলে ডুবে মারা যায়, তারপর থেকেই ইনি পাগল-মতো হ'য়ে গেছেন, আর জলে এমন ভয় হয়েছে যে স্নান পর্যন্ত করেন না। এমনি যার যা মনে হ'তো তাই বলতো! তবে মোটের উপর মানুষটা নিরীহ—কারু কোনো ক্ষতি করে না, আর তার অস্তিত্বও সহজেই ভুলে থাকা যায়, সেইজন্য এ নিয়ে কারু কোনো দুশ্চিন্তাও ছিলো না। এমন সর্বনেশে কাণ্ড যে ঘটতে পারে তা কেউ কখনো স্বপ্নেও ভাবেনি।



চার

মিনিট খানেক ঘরের সকলেই চুপ, তারপর নরেশ বললে, 'সত্যি ?'

নরহরিবাবু ক্ষীণস্বরে বললেন, 'সত্যি নয় তো কী ! আমি নিজের চোখে দেখে এলুম।'

'নিজের চোখে দেখে এলে ?'

'হ্যাঁ। হাত-মুখ ধুয়ে ভাবলুম, যাই উপরে গোবিন্দবাবুকে ডেকেই আনি। দুর্গা যে ব'লে গেলো বাবুর এখনো ঘুম ভাঙেনি—শুনে ভারি অবাক লেগেছিলো, কারণ আমি জানি খুব ভোরেই গোবিন্দবাবুর ঘুম ভাঙে। মনে হ'লো হয়তো ছাতে-টাতে বেড়াচ্ছেন, দুর্গা দেখতে পায়নি। গেলুম উপরে। ছাতে কোথাও তিনি নেই, দরজা বন্ধ। ফিরে আসছিলুম—হঠাৎ কী মনে হ'লো, ভাবলুম একটু ভালো ক'রে দেখে যাই। কেমন একটু কৌতূহল হ'লো। এতদিন আছি, কখনো তাঁর ঘরের ভিতরটা দেখিনি। ওঁর ঘরে ঐ একটাই তো জানলা, তাও অনেকটা উঁচুতে, অনেক চেষ্টা ক'রেও সে-জানলার কাছে মুখ নিতে পারলুম না। তখন আর কী করি, দরজাতেই আস্তে ধাক্কা দিলুম। অবাক হয়ে গেলুম যখন দেখলুম দরজাটা আস্তে খুলে গেলো। তাহ'লে খোলাই ছিলো দরজাটা! গোবিন্দ চাটুজ্যে দরজায় খিল না এঁটে ঘুমুচ্ছেন এ যে চোখে দেখেও বিশ্বাস হয় না। কিন্তু সত্যি—দরজা ফাঁক হ'য়ে আছে।'

ভূতের মতো অদ্ভুত

এই পর্যন্ত ব'লে নরহরিবাবু একটু থামলেন।

নরেশ রুদ্ধস্বরে বললে—'তারপর ?'

'কী-করি-কী-করি ভেবে কয়েক সেকেণ্ড কাটলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওঁর ঘরের ভিতরে একটু উঁকি দেবার কৌতূহল কিছুতেই সামলাতে পারলুম না। এই ঘর কতদিন ধ'রে একটা রহস্যপুরী হ'য়ে আছে, আজ হয়তো সে-রহস্যের কিছু সমাধান হবে, এই ভেবে ঘরের ভিতরে মুখ বাড়াতেই যে-দৃশ্য চোখে পড়লো—'

ব'লে নরহরিবাবু দু'হাতে মুখ ঢাকলেন।

কয়েক সেকেণ্ড ঘরের মধ্যে ভারি নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর-কিছু শোনা গেলো না। তারপর নরহরিবাবু আবার বলতে লাগলেন—'গোবিন্দবাবু মেঝের উপর চিৎ হ'য়ে প'ড়ে আছেন, হাত দুটো দু'পাশে ছড়ানো, চোখ দুটো প্রায় বেরিয়ে আসছে, আর মুখটা বীভৎস। উঃ!'

আনন্দ জিজ্ঞেস করলে, 'ঘরের ভিতর আর কী দেখলেন ?'

'কী যেন, তা তো মনে পড়ছে না।'

'রক্ত ?'

'কই, না।'

আনন্দ খুব সহজভাবে বললে, 'তাহ'লে গলা টিপে মেরেছে।'

মনোহর বাঁকা চোখে আনন্দর দিকে তাকিয়ে বললে, 'তুমি যেন খবরটা শুনে একটুও অবাক হ'লে না ?'

আনন্দ বললে, 'তা এ-সব লোকের কপালে অপমৃত্যু লেখাই থাকে।'

খবরটা দেখতে-দেখতে সমস্ত মেসে—এমনকি সমস্ত

পাড়ায় ছড়িয়ে পড়লো, আর রবিবার সকালের আনন্দ মুছে গিয়ে মেসের আবহাওয়া অস্বাভাবিক থমথমে হ'য়ে উঠলো। এত বড়ো একটা মেসে কারো গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না, কাজকর্ম সব বন্ধ।

ম্যানেজরবাবু নরহরিবাবুর ঘরে এসে বললেন, 'পুলিশে খবর দিয়েছি, ওরা এক্ষুনি লোক পাঠাচ্ছে। পুলিশ এসে তদন্ত ক'রে যতক্ষণ চ'লে না যায় আপনারা কেউ মেস থেকে বেরোবেন না যেন। যে যেখানে আছেন ব'সে থাকুন। উপরের ঘরেও কেউ যাবেন না—বুঝলেন ?—ও-ঘরে যা যেমন আছে পুলিশ না-আসা পর্যন্ত একচুল নড়চড় হ'তে পারবে না। চাকরদেরও সব ব'লে দিয়েছি—কারুর বেরুনো বারণ।'

হঠাৎ সরোজ ব'লে উঠলো, 'কিন্তু আমাকে যে বেরোতেই হবে—আমাদের বড়োবাবুর মেয়ের আজ বিয়ে—'

'অসম্ভব।'

সরোজ আকুল হ'য়ে বলতে লাগলো, 'ওখানে না-গেলে আমার চলবেই না—আমার চাকরি যাবে—না-খেয়ে মরবো। আমায় ছেড়ে দিন, আমায় যেতে দিন—' বলতে-বলতে সরোজ দরজার কাছে ছুটে গেলো, ম্যানেজরবাবু তাকে এক ধাক্কা দিয়ে বললেন—'কী ছেলেমানুষি করছো, চুপ ক'রে ব'সে থাকো।'

সরোজ কাঁপতে-কাঁপতে বললে, 'হরি-দা, তুমি একটু ব'লে দাও, আমাকে যেতেই হবে—আমার চাকরি থাকবে না—'

নরহরিবাবু বললেন, 'অত ব্যাকুল হোয়ো না, সরোজ, চুপ ক'রে বোসো। কিচ্ছু ভয় নেই।'

সরোজ হতাশভাবে ব'সে প'ড়ে ঠকঠক ক'রে কাঁপতে

লাগলো। তার ভাব দেখে মনে হয় তার যেন এক মস্ত বিপদ ঘনিয়ে আসছে।

*　　*　　*　　*

আধ ঘণ্টার মধ্যেই নিচের ফুটপাথ লাল পাগড়িতে ছেয়ে গেলো; তু'জন কনেস্টবল সঙ্গে নিয়ে মেসের ভিতর ঢুকলেন ইন্সপেক্টর রণজিৎ সামন্ত। সিঁড়ির ধারেই তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন ম্যানেজারবাবু।

ম্যানেজারবাবুর নাম পশুপতি ঘোষ। দেশ বরিশালে, মেজাজ বেশ কড়া। একটানা পাঁচ বছর তিনি ব্রড্ওয়ে হোটেলের পরিচালনা করছেন, তাঁর প্রতাপে ও প্রভাবে মেসের যথেষ্ট উন্নতি ও সুনাম হয়েছে—আর এর মধ্যে এ কী কাণ্ড! বিপদের মুখে ঘাবড়ে যাবার লোক তিনি নন, মনে-মনে বরঞ্চ বেশ চ'টেই আছেন—কোন তুষমনের এত সাহস যে তাঁর মেসের মধ্যে একটা খুন ক'রে গেলো, তাঁর এত কষ্টে অর্জিত সুনামে কলঙ্কের কালি এঁকে!

'আসুন, ইন্সপেক্টরবাবু, আসুন। খুনি ব্যাটাকে কিন্তু ধ'রে দেওয়া চাই। ও ধরা না-পড়া পর্যন্ত আমি কিছুতে ছাড়বো না—হ্যাঁঃ, আমি-বরিশালের লোক, সেটা জানেন তো!'

রণজিৎবাবু বললেন, 'সেটা আপনার কথা শুনেই টের পেয়েছি। চলুন তো উপরে, দেখা যাক।'

গোবিন্দ চাটুজ্যের পরিচয় দিতে-দিতে ম্যানেজারবাবু ইন্সপেক্টরের সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলেন। কেমন লোক ছিলেন গোবিন্দবাবু, অন্য সকলের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার কেমন ছিলো। খানকয়েক ডিটেক্টিভ নভেল পড়া ছিলো ম্যানেজার-বাবুর, তা থেকে তাঁর জানা ছিলো যে কোনো খুন হ'লে নিহত

ব্যক্তি সম্বন্ধে খবর নেয়াই সকলের আগে দরকার। তাঁর নিজের বুদ্ধি ও তৎপরতার উপর তাঁর এতদূর বিশ্বাস ছিলো যে তাঁর সাহায্য ছাড়া যে এ-রহস্যের কোনো কূল-কিনারা হ'তে পারে তা তিনি ভাবতেও পারতেন না।

তেতলায় এসে রণজিৎবাবু বললেন, 'এর পর কোনদিকে?'

'গোবিন্দবাবুর ঘর চারতলায়।'

রণজিৎবাবু চারতলার সিঁড়ির দিকে মাত্র পা বাড়িয়েছেন, এমন সময় নরহরিবাবুর ঘর থেকে দুর্গা বেরিয়ে এলো কয়েকটা চায়ের পেয়ালা হাতে ক'রে। তাকে দেখেই রণজিৎবাবু থমকে দাঁড়ালেন।

দুর্গা পেয়ালাগুলো নিয়ে বেগে নেমে যাচ্ছিলো, রণজিৎবাবুর দিকে চোখ পড়তেই সে-ও যেন কেমন আড়ষ্ট হ'য়ে দাঁড়িয়ে গেলো। পশুপতিবাবু এটা লক্ষ্য ক'রে বললেন, 'কী হ'লো? ওকে আপনি চেনেন নাকি?'

'হ্যাঁ, চিনি বইকি, ব'লে রণজিৎবাবু হেসে এগিয়ে গেলেন দুর্গার দিকে। বললেন, 'কী খবর চঞ্চল, কেমন আছো?'

দুর্গা—মানে, চঞ্চল—কী যেন বলতে যাচ্ছিলো, এমন সময় পশুপতিবাবু দু'জনের মাঝখানে এসে বললেন, "আপনি ওকে বেশ ভালোই চেনেন, মনে হচ্ছে। দেখুন, ও যদি কোনো দাগি আসামি বা অন্য-কিছু হয় তাহ'লে আমি কিন্তু দায়ী নই—ওকে আপনি যা খুশি তা-ই করতে পারেন। ও নতুন এসেছে, ওর সম্বন্ধে আমি কিছুই জানিনে। বরং ওর হাব-ভাব দেখে আমার কেমন একটু সন্দেহই হয়।'

'ঠিক বলেছেন, সন্দেহ হবারই কথা।'

'ওকে আপনি কী-একটা অন্য নামে যেন ডাকলেন না?

ভাবছেন আমি শুনিনি? সব শুনেছি। এখন কথা হচ্ছে, যে-লোক ভদ্দরলোকের ছেলে হ'য়ে নাম ভাঁড়িয়ে মেসের চাকরের কাজ করতে আসে, তাকে কি বিশ্বাস করা যায়? তার উপর এই তো একটা অঘটন ঘটলো। ছাখো ছোকরা, তুমি যতই চালাক হও, আমার সঙ্গে চালাকিতে তুমি পারবে না, তা জেনো। তোমার মৎলবখানা কী, খুলে বলো দেখি? আর এই যে গোবিন্দবাবু খুন হলেন, সে-বিষয়েই বা তুমি কতদূর কী জানো, শুনি? সব বলতে হবে, কিছু গোপন করা চলবে না। ভালোয়-ভালোয় বলবে তো ভালো, নয়তো কী ক'রে পেট থেকে কথা আদায় করতে হয় তা আমার ভালোই জানা আছে। হুঁ-হুঁ, আমি যে-সে লোক নই, দেশ আমার বরিশালে। আর দেখছো তো পুলিশের ইন্সপেক্টর সামনেই রয়েছেন—প্যাঁচ কষতে গেলে আরো বিপদে পড়বে।'

'ইন্সপেক্টরবাবুকে জিজ্ঞাসা করুন না আমার কথা,' বললে চঞ্চল।

রণজিৎবাবু বললেন, 'আপনি কিছু ভাববেন না, ওর ভার আমিই নিচ্ছি। আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, এর সঙ্গে আমি একটু কথা বলে নিই।'

পশুপতিবাবু গলা খাটো ক'রে বললেন, 'ছোকরাকে অ্যারেস্ট করলেন তো? আমার মনে হচ্ছে ও তলে-তলে এর মধ্যে আছে। ওকে ছেড়ে রাখা কোনো কাজের কথা নয়।'

'না, না, ওকে ছাড়বো না। চোখে-চোখেই রাখবো। আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, একে জেরা ক'রে দেখি—কিছু বেরোয় কিনা।'

পশুপতিবাবু উৎসাহিত হ'য়ে বললেন, 'হ্যাঁ, তা-ই ভালো। কার পেটে কী আছে কে জানে! আজকালকার দিনে কাউকেই বিশ্বাস নেই, মশায়। এই তো সেদিন আমাদের দেশের বাড়িতে…'

পাঁচ

কিন্তু রণজিৎ সামন্ত পশুপতিবাবুর কথা শেষ পর্যন্ত শোনবার জন্য অপেক্ষা করলেন না। দুর্গা—অথবা চঞ্চলকে—একটু দূরে ডেকে নিয়ে বললেন, 'চঞ্চল, এ তুমি করেছো কী?'

হাত থেকে পেয়ালাগুলো নামিয়ে চঞ্চল বললে, 'কেন, কী করেছি?'

'শেষটায় এই মেসে—চাকরের কাজ করছো!'

চঞ্চল মেঝের দিকে তাকিয়ে বললে, 'তা ছাড়া উপায় কী!'

'উপায় ছিলো বইকি। তুমি যদি আমার কাছে আসতে—'

'কী ক'রে জানবো আপনি আমাকে মনে রেখেছেন?'

'বাঃ, সেই "কলকাতা হরকরা"র ব্যাপারে তুমি যে-রকম সাহস আর বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলে—তোমাকে কি ভুলতে পারি! আমি বরং মনে-মনে ভেবেছি সে-ছোকরাটির হ'লো কী? দেখা পেলে বেশ হ'তো—কাজে লাগাতে পারতুম। তারপর—এ ক'মাস তুমি কোথায় ছিলে, কী করলে সব বলো আমাকে।'

ভূতের মাসে অদ্ভুত

'বলবার বিশেষ-কিছু নেই। "কলকাতা হরকরা" উঠে যাবার পর আমি একেবারে অকূলে ভাসলুম। তাই ব'লে খুব যে ঘাবড়ে গেলুম তাও নয়, এ তো আমার অভ্যেসের মধ্যেই—ছেলেবেলা থেকে এই রকমই তো চলছে। পকেটে একটি টাকা আর কয়েক আনা পয়সা ছিলো; খুচরোটা নিজে রেখে এক টাকার চীনে সিঁদুর, চুলের কাঁটা, বেলুন বাঁশি এ-সব কিনে ফেললুম রাধাবাজার থেকে। তারপর তাই নিয়ে বালিগঞ্জে ফেরি করতে বেরোলুম। রোদ্দুরে বৃষ্টিতে বেশ কষ্ট হতো, কিন্তু রোজগারও মন্দ হ'তো না।'

'কত পেতে?'

প্রথমটায় দু' আনা দশ পয়সার বেশি হ'তো না রোজ, কিন্তু তাই থেকে দু'চার পয়সা জমিয়ে-জমিয়ে আমার পুঁজি যখন একটু বাড়লো, তখন জিনিসের স্টক ক্রমেই বাড়াতে পারলুম—শেষের দিকটায় চার আনা ছ' আনা এমনকি আট আনা পর্যন্ত রোজগার হ'তো।'

রণজিৎবাবু সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তাতে তোমার চলতো?'

'বলেন কী! চলবে না! রোজ চার আনা যে অনেক। পাইস হোটেলে দু' আনায় রীতিমতো ভোজ হ'য়ে যায় এক-বেলা। দু' পয়সায় এক পেয়ালা চা, আর ছ'পয়সা হাতে থাকে। চার আনা কি কম!'

রণজিৎবাবু হেসে উঠে বললেন, 'তুমি অবাক করলে, চঞ্চল! এত কষ্ট করতে সত্যি পারো তুমি?'

চঞ্চল বিনীতভাবে বললে, 'না, তা আর পারি কই! হাজার হোক, ভদ্রলোকের রক্ত তো বইছে শরীরে। ভদ্রলোকের

কাজ তো জোটেই না, এদিকে কুলির সঙ্গেও প্রতিযোগিতায় পারি না—এই তো এখন আমাদের অবস্থা। জিনিস ফেরি ক'রে একরকম চ'লে যাচ্ছিলো, কিন্তু হঠাৎ অসুখ ক'রেই আবার গোল বাধালে।'

'অসুখের আর দোষ কী! নাওয়া খাওয়া শোওয়া কিছুরি ঠিক নেই—রোদ জল মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে—ঐ তুমি যা বললে—এ কি আর ভদ্রলোকের সয়! আমি অবাক হচ্ছি এ-কথা ভেবে যে তুমি তক্ষুনি কোনো খবর-কাগজের আপিশে চেষ্টা করলে না কেন। ও-লাইনে তোমার তো অভিজ্ঞতা ছিলো!'

'চেষ্টা করলেই যে হতো তার তো মানে নেই। চাওয়া-মাত্র কি আর কোনো চাকরি হয়! এদিকে আমার যে এখন-তখন অবস্থা—আজকে রোজগার না-করলে আজকেই উপোস। কাগজের আপিশে চেষ্টা করতে গেলে হাঁটাহাঁটিই হ'তো সার—এদিকে আমার সেই এক টাকা সাড়ে-সাত আনাও খামকা খরচ হ'য়ে যেতো। তাছাড়া "হরকরা" নিয়ে যে-রকম একটা কেলেঙ্কারি হ'লো, আমাকে হয়তো কেউ বিশ্বাস করতো না, হয়তো সন্দেহ করতো আমিও তলে-তলে ষড়যন্ত্রের মধ্যে ছিলুম। তাছাড়া আমি যে "হরকরা"য় কাজ করেছি তারই বা বিশ্বাস কী! একটা সার্টিফিকেট নেই, কিচ্ছু নেই! আপনিই বলুন, তার চেয়ে এই কি ভালো করিনি! চাকরির চেষ্টার চাইতে হাঁটাহাঁটি খুব বেশি হ'লো না, অথচ সঙ্গে-সঙ্গে দুটো পয়সাও পকেটে এলো—অবশ্যি আপনাদের অর্থে "দুটো পয়সা' নয়, অভিধানের অর্থে।'

'তুমি তো দেখছি কথাবার্তাতেও বেশ তুখোড়, মিষ্টি ক'রে জুতোও দিতে পারো,' মন্তব্য করলেন সামন্তমশাই।

'কিছু মনে করবেন না, সত্যি কথাটা মুখে এসে পড়লো—'

'সে যাকগে—যখন অসুখ করলো, কী করলে তুমি?'

'কী আর করবো—সোজা হাসপাতাল। টাইফয়েড হয়েছিলো—আট-দশ দিন নাকি স্রেফ অজ্ঞান হ'য়ে ছিলুম। অসুখের কথা ভালো ক'রে আমার মনেও পড়ে না—কেমন একটা স্বপ্নের মতো মনে হয়। এটা কিন্তু মস্ত বাঁচোয়া—অতখানি কষ্ট সজ্ঞানে ভোগ করতে হ'লে আর উপায় ছিলো না। দু' মাস পরে অত্যন্ত রোগা হ'য়ে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এলুম। পকেটে একটি পয়সা নেই। যখন ফেরিওলা ছিলুম, চানাচুর চিবিয়ে ফুটপাতে ঘুমিয়ে দিব্যি দিনের পর দিন কেটে গেছে, কিন্তু এখন দুর্বল শরীরে মনে হ'লো একটা আশ্রয় পেলে ভালো হয়। সঙ্গে-সঙ্গেই মনে হ'লো চাকরের কাজ পেলে বেশ হয়, দু'বেলা খাওয়া জোটে, তাছাড়া ঘুমোবার একটা নির্দিষ্ট জায়গাও পাওয়া যায়। বৌবাজার দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে একটা পানের দোকানে খবর পেলুম ব্রডওয়ে হোটেলে একটা চাকরি খালি আছে। এক সেকেণ্ডও দেরি না-ক'রে এই হোটেলে এসে হাজির হলুম। ম্যানেজরবাবু আমার সঙ্গে দুটো চারটে কথা ব'লেই যেন খুশি হলেন—জানি না কী-কারণে আমি তাঁকে খুশি করতে পেরেছিলুম। সেই থেকে আছি।'

'কত মাইনে পাও?'

'পাঁচ টাকা। তাছাড়া বাবুরা মাঝে-মাঝে বখশিষ দেন—মোটের উপর কাজটা ভালোই।'

'হ্যাঁ, ভালোই', ব'লে রণজিৎবাবু একটু হাসলেন।

'ভালো বইকি, পঁচিশ টাকা মাইনের কেরানিগিরির চাইতে'



'এ কি সত্যি ? যা শুনছি এ কি সত্যি ?...'

নিশ্চয়ই ভালো। কেরানিকে লোকে "আপনি" বলে, আর চাকরকে বলে "তুমি"—এ ছাড়া এ দুই কাজে আর-কোনো তফাৎ তো আমি দেখতে পাইনে।'

রণজিৎবাবু বললেন, 'ওটাই তো মস্ত তফাৎ।...কিন্তু সে যাই হোক, এ-ভাবে আর কতকাল কাটাবে তুমি?'

'যতদিন এর চেয়ে ভালো কিছু না জোটে।'

'জোটাবার চেষ্টা কিছু করছো কি?'

চঞ্চল চুপ ক'রে রইলো।

রণজিৎবাবু তার কাঁধে হাত রেখে মৃদুস্বরে বললেন, 'সাবাস ছেলে তুমি, চঞ্চল, আমার যদি তোমার মতো একটা ছেলে থাকতো, নিজেকে ধন্য মনে করতুম। এ-রকম আত্মনির্ভরশীল ছেলে বাংলাদেশে ক'টা আছে! এই তো চাই! তোমাকে দেখে, তোমার কথা শুনে আনন্দ যেমন হচ্ছে তেমনি মনটাও একটু খারাপ লাগছে এ-কথা ভেবে যে এত দুঃখে প'ড়েও আমাকে তুমি একবার মনে করলে না! তোমার কি একবারও মনে হলো না যে আমি তোমার কোনো কাজে লাগতে পারি?'

চঞ্চল আমতা-আমতা ক'রে বললে, 'মনে যে না হয়েছিলো তা নয়, কিন্তু আপনার বাড়ির ঠিকানা...'

সামন্তমশাই হেসে উঠে বললেন, 'সে তো টেলিফোনের বই খুললেই পেতে। যতই তুখোড় হও না, এখনো একেবারে ছেলেমানুষ আছো দেখছি।'

চঞ্চল কিছু বললে না।

একটা কথা তোমাকে বলি, চঞ্চল। এখান থেকে এবার তুমি ছুটি নাও। আমার ওখানে চলো—ভুল বুঝো না,

তোমাকে আমার উপর নির্ভর করতে বলছি না—যতদিন ভালো কোনো কাজ না-জোটে আমার ওখানে থাকবে আরকি। আর কাজ যাতে তাড়াতাড়ি জোটে সেজন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো। আশা করি এতে তোমার আপত্তি হবে না। কী বলো ?'

চঞ্চল নিচু গলায় বললে, 'বেশ তো, আপনি যে-রকম বলছেন তা-ই হবে।'

'পশুপতিবাবু তোমাকে আর রাখবেনও না এ তুমি ঠিক জেনো। একবার যখন তোমাকে সন্দেহ করেছেন···যে-রকম জবরদস্ত লোক দেখছি !'

শেষের কথাটা ব'লে রণজিৎবাবু একটু হাসলেন।—'চলো এবার, এই ব্যাপারটার কিছু হদিশ করতে পারি কিনা দেখি।'

'চলুন।'

রণজিৎবাবু এগিয়ে এসে বললেন, 'এবার চারতলায় যাওয়া যাক।'

পশুপতিবাবু উদ্‌গ্রীব হ'য়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওর পেটের কথা বের করতে পারলেন কিছু ?'

'ওর জন্যে ভাববেন না, ওকে আমি ঠিক ক'রে নেবো। চলো হে চঞ্চল, তুমিও চলো আমাদের সঙ্গে চারতলায়।'

ছয়

এমন সময় চটি চটপট করতে-করতে নরহরিবাবু বেরিয়ে এলেন বাইরে। তাঁকে দেখেই পশুপতিবাবু ব'লে উঠলেন, 'আসুন মশাই, শুনে যান আপনার পেয়ারের চাকরের কাণ্ড। আমি বরাবরই বলেছি—'

তাঁর কথায় বাধা দিয়ে নরহরিবাবু বললেন, 'কেন, হয়েছে কী ?'

'আরে মশাই ও আসলে চাকরই নয়। দেখছেন না, কেমন সুন্দর চেহারা, পরিষ্কার হাত-পা। উনি ভদ্দরলোকের ছেলে, নাম ভাঁড়িয়ে বাসন মাজতে এসেছেন। ইন্সপেক্টরবাবু তো ওকে দেখেই চিনে ফেলেছেন। দাগি আসামি কিনা।'

নরহরিবাবু মনে-মনে শিউরে উঠে বল্‌লেন, 'সে কী কথা !'

রণজিৎবাবু বললেন, 'দাগি আসামি তা তো আমি বলিনি।'

'আহা—আপনারা কি আর সব কথা খুলে বলবেন ! যাই হোক্, এর আসল নাম হচ্ছে—কী যেন তোমার নামখানি বাপু ?'

'চঞ্চল নাগ।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, চঞ্চল নাগ—খাশা অতি-আধুনিক নাম। তা এই তো ব্যাপার—এদিকে দেখছেন তো অবস্থা। আপনাদের সবাইকে ব'লে রাখছি, সাবধানে থাকবেন—যা দিনকাল পড়েছে, কখন কী হয় কিছুই বলা যায় না।'

ভূতের মতো অদ্ভুত

নরহরিবাবু বললেন, 'তা ভদ্রলোকের ছেলে বিপাকে প'ড়ে চাকরের কাজ করতে এসেছে, এ এমন একটা অন্যায় কী।'

'থাক, থাক, আপনার সঙ্গে ও-সব কথা পরে হবে, এখন সময় নেই। ইন্সপেক্টরবাবু, ইনিই আমাদের নরহরি-দা, ইনিই সকালবেলা চারতলায় গিয়ে ভীষণ দৃশ্য দেখে আসেন।'

'ও, আপনিই প্রথমে ছাখেন ? তাহ'লে আপনিও চলুন আমাদের সঙ্গে, আপনার কথা শোনাও হবে।'

'কোথায় যেতে হবে ?'

'বেশিদূর নয়, এই চারতলায়। তুমিও এসো, চঞ্চল।'

চারজনে গেলেন চারতলায়।

* * * *

চারতলার প্রায় সমস্তটাই ছাত, শুধু এক কোণে ছোট্ট একটি ঘর, আসলে সেটি চিলেকোঠা। কার্ণিশে ঘেরা এই মস্ত ছাত কেউ বিশেষ ব্যবহার করে না। প্রায় সকলেই চাকুরে, সকলেরই সময়াভাব, ছাতে এসে হাওয়া খাবার মতো বাবুগিরি কারুরই পোষায় না। তাছাড়া গোবিন্দবাবুর অখ্যাতি সমস্ত মেসে এতই রাষ্ট্র যে কদাচ কারো শখ হ'লেও ঐ দাড়িওলা অলক্ষুনে মুখ মনে করলেই ছাতে যাবার ইচ্ছে উবে যায়। ছাতটি বলতে গেলে গোবিন্দবাবুর একলারই দখলে ছিলো।

ঘরে ঢোকবার আগে রণজিৎবাবু ছাতটি বার দুই ঘুরে এলেন। আশ্চর্য—ছাতটি একেবারে তকতকে পরিষ্কার, একটা কাগজের টুকরোও কোথাও প'ড়ে নেই। কার্ণিশে ভর দিয়ে নিচের দিকেও তাকিয়ে দেখলেন—জলের পাইপ বেয়ে উঠে আসা অবশ্য অসম্ভব নয়, কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই বা ক্ষতি কী ?

ভূতের মতো অদ্ভুত

তারপর গেলেন ঘরের ভিতরে। কনেস্টবল দু'জন সিঁড়ির কাছে রইলো।

চারজন মানুষে ঘরটা যেন একেবারে ভ'রে গেলো। দড়িতে ঝোলানো সামান্য দু' একটা জামাকাপড়, টিনের একটা ভাঙা তোরঙ্গ—জিনিস বলতে এই। আর মেঝেতে হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হ'য়ে পড়ে আছেন গোবিন্দ চাটুজ্যে—মুখটা ফুলে বীভৎস হয়েছে, জিভ এসেছে বেরিয়ে, ভালো চোখটা এমন বড়ো যেন দৈত্যের চোখ, আর কানা চোখটা যেন আরো বুঁজে চামড়ার মধ্যে ঢুকে গেছে—গলায় চাক-চাক মাংস উঠেছে লাল হ'য়ে ফুলে।

রণজিৎবাবু একটু তাকিয়ে থেকে বললেন, 'নৃশংস বলতে হয় এই হত্যাকারীকে। বুকের উপর হাঁটু চেপে ব'সে গলা টিপে মেরেছে। দেখছেন গলায় লাল-লাল দাগ!' ব'লেই তিনি মৃতদেহের পাশে হাঁটু ভেঙে ব'সে প'ড়ে জামার পকেটে হাত ঢোকালেন।

পকেট থেকে কিছুই পাওয়া গেলো না। তারপর খোলা হ'লো তোরঙ্গ।

প্রথমে বেরুলো গোটা কয়েক পুরোনো, পাতা-ছেঁড়া নাটকের বই, তারপর এক কৌটো দাঁতের মাজন, তারপর এক জোড়া নোংরা চিটচিটে তাস. তারপর—ব্যস, আর কিছু না। টাকাকড়ি? একটা আধলাও না।

গোবিন্দ চাটুজ্যের পার্থিব সম্পত্তি দেখে সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো।

নরহরিবাবু বললেন, 'টাকার জন্যেই ভদ্রলোক প্রাণে মারা গেলেন। এই তোরঙ্গেই সব টাকাকড়ি রাখতেন নিশ্চয়ই—যে খুন করেছে সে নিয়ে সটকেছে।'

'কিন্তু তোরঙ্গ তো ভাঙা নয়,' বললেন ম্যানেজারবাবু।

'ভাঙবার দরকার কী—ওতে তো আর তালা ছিলো না। আর তোরঙ্গটা এতই পুরোনো যে তালা দেয়া সম্ভবও ছিলো না বোধ হয়।'

'তাহ'লে কি আপনি বলতে চান গোবিন্দবাবু তাঁর সব টাকাকড়ি একটা ভাঙা তোরঙ্গে ফেলে রাখতেন? তিনি কি এতই অসাবধান?'

'কত আর সাবধান হবেন! ঘর ছেড়েই তো বেরোতেন না।'

'হয়তো কোনো গুপ্ত জায়গায় লুকিয়ে রাখতেন? কি হয়তো তাঁর টাকাকড়ি কিছু ছিলোই না, সবই আমাদের অনুমান?' পশুপতিবাবুর ডিটেকটিভ নভেল-পড়া মগজে নানারকম থিওরি পাক খেয়ে বেড়াতে লাগলো। তিনি একটা লাঠি দিয়ে দেয়াল ঠুকে-ঠুকে দেখলেন, কোথাও একটু ফাঁপা আওয়াজ হয় কিনা। সমস্ত দেয়াল হাৎড়ে হাৎড়ে দেখলেন কোনো লুকোনো বোতাম বা হাতল হাতে ঠেকে কিনা। লাথি মেরে-মেরে মেঝের সীমেণ্ট প্রায় তুলে ফেললেন! কিন্তু এত ক'রেও কোনো ফল হ'লো না।

রণজিৎবাবু বললেন, 'নিহত ব্যক্তির সম্পত্তির সন্ধান পেতে আপনি বড়োই যেন ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, ম্যানেজারবাবু। কিন্তু বৃথা চেষ্টা, এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড যে করতে পারলো, সে কি আর টাকাকড়ির লোভ সামলাতে পেরেছে!'

পশুপতি বললেন—'না, না, তা নয়—এই দেখছিলুম আরকি। ভদ্রলোকের সবই রহস্যময় ছিলো কিনা। আপনার কী মনে হচ্ছে? কোনো ক্লু-টু পেলেন?'

'আপাতত একেবারেই অন্ধকার।'

ভূতের মতো অদ্ভুত

হঠাৎ চঞ্চল ব'লে উঠলো, 'এ তো ভারি আশ্চর্য!'

ঘরের এক কোণে গোবিন্দবাবুর বিছানাটা জড়ানো পুঁটলি হ'য়ে প'ড়ে ছিলো, এতক্ষণ কেউ তা লক্ষ্য করেনি। চঞ্চল গিয়ে সেটা টেনে খুলে ফেলেছে। বিছানা বলতে অবশ্য শুধু একটা কম্বল আর একটা ওয়াড়-ছাড়া চিটচিটে বালিশ। কিন্তু সেই কম্বলের মধ্যে জড়ানো একখানা মস্ত বড়ো ঝকঝকে দামি আয়না।

এই আয়নাটাই আশ্চর্য।

সবাই ঝুঁকে প'ড়ে আয়নাটা দেখতে লাগলো। সোনালি রঙের ফ্রেম, খাড়া রেখে দেখা গেলো কাঁচটা অন্তত এক ইঞ্চি পুরু। একটা পয়সা খরচ করতে যার প্রাণ বেরিয়ে যেতো, তার এই দামি আয়নার [illegible] শখ কেন? আশ্চর্যই বটে।

ম্যানেজারবাবু বললেন, 'বুড়োর প্রাণে তো রস ছিলো খুব! নিজের ঐ অলক্ষুনে মুখখানাই বোধ হয় দেখতো ব'সে-ব'সে।'

'কেন, অলক্ষুনে মুখ কেন?' জিজ্ঞেস করলেন ইন্সপেক্টর।

'কেন অলক্ষুনে তা তো নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছেন। খুন হ'য়ে ইনি অবশ্য দেখতে ভয়াবহ হয়েছেন, কিন্তু বেঁচে থেকেও যে এর চেয়ে বেশি সুশ্রী ছিলেন তা তো নয়। আচ্ছা, ঐ বালিশটার ভিতরে নোট-টোট কিছু নেই তো?'

ব'লে পশুপতি বালিশটা তুলে নিয়ে এক টানে খোলটা ছিঁড়ে ফেললেন। সারা ঘরে তুলো ছড়িয়ে পড়লো, নোট একটিও বেরুলো না।

চঞ্চল তখনও আয়নাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলো, হঠাৎ

ভূতের মতো অদ্ভুত

কোথা থেকে একটা তীব্র আলো এসে তার চোখ ধাঁধিয়ে দিলে। উপরের দিকে তাকিয়ে দেখলে, ঘরের ইলেকট্রিক বাল্‌ব্‌টা তখনও জ্বলছে। দিনের আলোয় কেউ তা এতক্ষণ লক্ষ্য করেনি।

রণজিৎবাবুকে ডেকে সে বললে, 'দেখছেন—কে বা কারা হাতের কাজ শেষ ক'রে আলোটা নেবাতে ভুলে গিয়েছিলো।'

রণজিৎ বললেন, 'তা-ই তো দেখছি।'

চঞ্চল বললে, 'আচ্ছা, আলোটা খুব বেশি উজ্জ্বল নয় কি? এই দিনের আলোতেও কেমন চোখে লাগছে।'

'হ্যাঁ, খুবই উজ্জ্বল। অন্তত একশো পাওয়ার হবে।'

'এতটুকু ঘরে একশো পাওয়ারের আলো! ভদ্রলোকের কি মাথা খারাপ ছিলো?'

'তা লোকের কত রকমই খেয়াল থাকে,' ব'লে রণজিৎবাবু শিষ দিতে-দিতে উঠে দাঁড়িয়ে আলোটা নিবিয়ে দিলেন। ম্যানেজরবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বালিশটা মিছিমিছি ছিঁড়লেন দেখছি। তা এখানে তো আর-কিছু করবার নেই। চলুন নিচে গিয়ে গল্প-টল্প করা যাক।—আহা, কী নিষ্ঠুরভাবে মেরেছে লোকটাকে,' ব'লে তিনি মৃতদেহের কাছে গিয়ে মুখে চুলে দাড়িতে একটু হাত বুলোলেন।

পশুপতি হঠাৎ ব'লে উঠলেন, 'আমাদের একটা কিন্তু ভুল হ'য়ে গেছে—ডাক্তার ডাকা হয়নি।'

রণজিৎ বললেন, 'ডাক্তারের দরকার হবে না। ইনি যে আত্মহত্যা করেননি সেটা নিঃসন্দেহ। এ ছাড়া আর যা জানবার তা ধরা পড়বে পোস্টমর্টেমে।'

'মৃতদেহ কি এখনই সরিয়ে নেবেন?'

'একটু পরেই। আপনাদের সঙ্গে দু'একটা কথা আছে। চলুন নিচে।'

সাত

ম্যানেজরবাবু ইন্সপেক্টরকে নরহরি-দার ঘরে এনেই বসালেন। সেখানে মনোহর, সরোজ, নরেশ আর আনন্দ তখনো ব'সে আছে।

ম্যানেজরবাবু বললেন, 'এদের কি বাইরে যেতে বলবো?'

'না, না, আমার কথা কিছু গোপনীয় নয়। দু' একটা খোঁজ-খবর নেবো শুধু। আচ্ছা, কাল রাত্রে আপনারা গোবিন্দবাবুকে শেষ কখন দেখেছিলেন?'

সকলেই বললে যে রাত্রে কেউ তাঁকে ছাখেনি, এমনকি বিকেলের দিকেই দেখেছে ব'লে কারুর মনে পড়ে না। পশুপতি বুঝিয়ে বললেন যে গোবিন্দবাবু মানুষটা মোটেও মিশুক ছিলেন না, নেহাৎ দরকার না-হ'লে উপর থেকে নামতেন না, খাওয়া-দাওয়াও নিজের ঘরেই করতেন। তাঁর সঙ্গে মেসের পাঁচজনের দেখাশোনা বলতে গেলে হ'তোই না, শুধু নরহরি-দার ঘরেই এক-আধ সময় আসতেন।

'আপনার ঘরে আসতেন? কেন?'

'আসতেন তাস খেলতে।'

'তাস খেলতে ভালোবাসতেন বুঝি ?'

'হ্যাঁ, পৃথিবীতে ঐ একটা জিনিসেই তাঁর একটু আসক্তি ছিলো মনে হয়।'

'আর কিছু ভালোবাসতেন ?'

'মনে তো হ'তো না।'

'কথাবার্তা কী-রকম বলতেন ?'

'খুব কম।'

'কোনো বিশেষ বিষয়ে উৎসাহ ছিলো ?'

'কিছুমাত্র না।'

'একটু ভেবে দেখুন।'

'যদি খুব খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করেন তাহ'লে বলতে হয় এক থিয়েটরের কথা উঠলে ভদ্রলোকের একটু উৎসাহ দেখা যেতো।'

'অথচ তিনি থিয়েটরে কখনো যেতেন না ?'

'কখনোই না। বাড়ির বাইরেই যেতেন না কখনো।'

'আচ্ছা। এবার আপনি বলুন ম্যানেজরবাবু, গোবিন্দবাবুর বিষয়ে কী জানেন ?'

পশুপতি তাঁর ম্যানেজরির প্রথম দিন থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা শুরু করলেন। গোবিন্দবাবু কী করতেন, কী খেতেন, চাকরদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতেন—কিছুই সে বর্ণনা থেকে বাদ গেলো না। সব শুনে ইন্সপেক্টর জিজ্ঞেস করলেন ঃ

'তাঁর দেশ কোথায় ছিলো ?'

'তা তো জানিনে।'

'তাঁকে কখনো জিজ্ঞেস করেছেন ?'

'অনেকবার করেছি, কোনো জবাব পাইনি। এটুকু মাত্র

বলতে পারি যে কথা শুনে চব্বিশ পরগনার লোকই মনে হ'তো।'

'তাঁর কোনো আত্মীয়স্বজন…?

'কারো কথা জানিনে।'

'কেউ দেখা করতে আসতো তাঁর সঙ্গে ?'

'কেউ না। আর এতদিনের মধ্যে তাঁর একটা চিঠি এসেছে ব'লেও জানা যায়নি।'

হঠাৎ আনন্দ ব'লে উঠলো, 'কাল কিন্তু ওঁর নামে একটা চিঠি এসেছিলো।'

'অ্যাঁ ? চিঠি ? ওঁর নামে ?' পশুপতি রীতিমত চমকে উঠলেন।

'হ্যাঁ, ওঁর নামে চিঠি।'

'তুমি জানলে কেমন ক'রে ?'

'কাল সকালে আমার কোনো চিঠি এসেছে কিনা দেখবার জন্য আমি লেটারবক্স ঘাঁটছিলাম, নানা চিঠির মধ্যে গোবিন্দ চ্যাটার্জির নামে একটি পোস্টকার্ড চোখে পড়লো।'

ইন্সপেক্টর জিজ্ঞেস করলেন, 'ঠিক মনে আছে আপনার ?'

'ঠিক মনে আছে। ওঁর নামে কখনো কোনো চিঠি আসে না, সেইজন্য ওটা লক্ষ্য করেছিলাম। কোনো জরুরি খবর এসেছে মনে ক'রে আমি তখুনি সেটা চাকরের হাতে পাঠিয়ে দিলাম চারতলায়।'

ম্যানেজরবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ছিলো সে-চিঠিতে ?'

'তা জানিনে। পরের চিঠি পড়বার অভ্যেস আমার নেই।'

মনোহর বললে, 'তুমি তো খুব পরোপকারী ছেলে, আনন্দ, তক্ষুনি চিঠিটা চাকর দিয়ে পাঠিয়ে দিলে।'

'তা দিয়েছিলুম, আপনাদের মতো টিপ্পনি কেটেই তো আমার দিন যায় না।'

পশুপতি ব'লে উঠলেন, 'থাক, থাক, তোমার আর ফাজলেমি করতে হবে না। কোন চাকর দিয়ে পাঠিয়েছিলে?'

'কেষ্টাকে দিয়ে।'

ডাকা হ'লো কেষ্টাকে। কেষ্ট বললে যে হ্যাঁ, কাল সকালে একতলার বাবু তার হাতে একখানা পোস্টকার্ড দিয়েছিলেন বটে চারতলার বাবুকে দিয়ে আসতে।

'তুই সেটা তখুনি দিয়ে এসেছিলি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'চিঠি পেয়ে চারতলার বাবু কিছু বললেন?' জিজ্ঞেস করলেন ইন্সপেক্টর।

কেষ্ট মাথা নাড়লো।

'তাঁর মুখের চেহারা চিঠি পেয়ে কেমন হ'লো?'

কিন্তু কেষ্ট আর-কিছুই বলতে পারলে না। চিঠি দিয়েই সে চ'লে এসে ছিলো।

ম্যানেজরবাবু বললেন, 'পোস্টকার্ডটা ঘরের মধ্যে পাওয়া গেলে একটু সুরাহা হতো।'

ইন্সপেক্টর বললেন, 'সেইজন্যেই তো পাওয়া গেলো না।'

'আপনি তাহ'লে মনে করেন পোস্টকার্ডটার সঙ্গে এই ঘটনার কোনো যোগাযোগ আছে?'

'তা-ই তো মনে হচ্ছে।'

মেসের আরো অনেককে জেরা করা হ'লো, তা থেকে দুটো খুব বড়োরকমের খবর বেরুলো। দোতলার ললিতবাবু বললেন যে কাল রাত প্রায় দুটোয় তিনি থিয়েটর দেখে ফিরেছিলেন।

মেসের কাছে এসে তিনি দেখেছিলেন যে সমস্ত বাড়িটা অন্ধকার, শুধু চারতলার এক কোণে আলো জ্বলছিলো। তিনি মনে-মনে ভেবেছিলেন—বিটকেল বুড়ো এত রাতে আলো জ্বেলে কী করছে—সে-কথা তাঁর মনে আছে!

'আলোটা কি আপনার চোখে খুব বেশি উজ্জ্বল লেগেছিলো?'

'তা তো বলতে পারবো না। কার্ণিশের ফুটো দিয়ে একটুখানি আলোই চোখে পড়েছিলো।'

'তবে আলো দেখেছিলেন সেটা ঠিক মনে আছে?'

'হ্যাঁ, আলো দেখেছিলুম ঠিকই।'

ইন্সপেক্টর জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, আপনারা কেউ কি কখনো লক্ষ্য করেছেন যে গোবিন্দবাবুর ঘরের আলোটা খুব বেশি জোরালো?'

এ-কথার কোনো জবাব কেউ দিতে পারলে না, কারণ গোবিন্দবাবুর ঘরের অভ্যন্তর সকলেরই অজ্ঞাত।

আর-একটা খবর দিলে মেসের ঠাকুর। সে বললে যে গোবিন্দবাবু তাকে বলেছিলেন যে তাঁর ভাই কাল দেশ থেকে আসছে, তার খাবার ব্যবস্থা যেন করা হয়।

'কবে বলেছিলেন?'

'কাল।'

'কখন বলেছিলেন?'

'দুপুরে তাঁর খাবার নিয়ে যখন যাই, তখন।'

'কী বলেছিলেন তোমাকে ঠিক ক'রে বলো তো?'

ঠাকুর একটু ভেবে বললে, 'বাবু বললেন, "ঠাকুর, কাল সকালে আমার ভাই আসছে দেশ থেকে। তার খাবার ব্যবস্থা কোরো। সে আমার মতো পেট-রোগা লোক নয়, বেশ খেতে-

টেতে পারে। ওর জন্যে আলাদা ক'রে একটু মাছ-তরকারি রান্না কোরো—বেশ ভালো ক'রে রেঁধো—তোমাকে বখশিষ দেবো।'"

এ-কথা শুনে সকলেই অবাক হ'য়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। প্রথম নম্বর তাজ্জব কথা এই যে ভূতের মতো অদ্ভুত ঐ মানুষটারও পৃথিবীতে একজন ভাই আছে—এবং তার চেয়েও যা আশ্চর্য—সেই ভাইয়ের জন্য হাড়-কঞ্জুষ গোবিন্দ চাটুজ্যে রীতিমতো ভোজের ফরমাস দিয়েছিলেন—এমনকি ঠাকুরকে বখশিষ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত ছিলেন!

পশুপতি বললেন, 'তাহ'লে বোঝা যাচ্ছে ঐ পোস্টকার্ডে ভাইয়ের আসবার খবরই ছিলো।'

'সেইরকমই তো মনে হয়', বললেন ইন্সপেক্টর।

রণজিৎবাবু তাঁর কথা মেনে নেয়ায় পশুপতি অত্যন্ত উৎসাহিত হ'য়ে উঠে বলতে লাগলেন—'এটাও মনে হয় যে এমন কেউ আছে ঐ দু'ভাইয়ে দেখা হওয়ার সঙ্গে—অর্থাৎ না-হওয়ার সঙ্গে—যার গভীর স্বার্থ জড়িত। সে চায় না যে গোবিন্দবাবুর সঙ্গে তাঁর ভাইয়ের সাক্ষাৎ হোক। অতএব তারই এই কাজ। এখন এটুকু শুধু জানতে বাকি থাকে সেই লোকটি কে?'

'বাঃ, বেশ বলেছেন। সমস্যাটা আপনি অনেকটা সরল ক'রে এনেছেন সে-কথা মানতেই হয়।'

ইন্সপেক্টর ঠাকুরকে আরো দু'একটা প্রশ্ন করলেন:

'গোবিন্দবাবু তোমাকে আর-কিছু বলেননি—না?'

'না, হুজুর।'

'রাত্রে যখন তাঁর খাবার দিতে গেলে?'

'না। আর কোনো কথাই বলেননি। তখন আমি তাঁকে দেখিওনি, দরজার বাইরে খাবার রেখে চ'লে এসেছিলুম। তাঁর ঘরের মধ্যে যাবার হুকুম তো আমাদের ছিলো না।'

'খাবারটা তিনি খেয়েছিলেন?'

'হাঁ। কেস্ট খানিকপরে গিয়ে থালাটা নিয়ে এসেছিলো।'

'আচ্ছা, রাত্রে তোমরা কোথায় শোও?'

'একতলায়—রান্নাঘরের দিকে।'

'কাল রাত্রে কোনোরকম শব্দ-টব্দ কিছু শুনেছিলে?'

'আমাদের তো শুতে-শুতেই একটা হয়।'

'তারপর?'

'না, মনে তো পড়ে না।...হ্যাঁ, ঘুমের মধ্যে একবার যেন কলতলায় জলের শব্দ শুনেছিলুম।'

পশুপতিবাবু ঠাকুরকে এক ধমক দিয়ে বললেন, 'কলতলায় জলের শব্দের কথা কেউ শুনতে চায় না। কোনো চীৎকার-টীৎকার শুনেছিস?'

কিন্তু বেচারা ঠাকুর তো একতলায় কত দূরে শোয়—তার আর দোষ কী? সমস্ত মেসে একজনও এমন কথা বলতে পারলে না যে গত রাত্রে সে এমন-কোনো শব্দ শুনেছে যা কোনো বিপন্ন কি মরণোন্মুখ ব্যক্তির চীৎকার ব'লে ভুল করা যায়।

আট

পশুপতিবাবু ইন্সপেক্টরকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, 'ঐ আনন্দ ছোকরাকে একটু লক্ষ্য করবেন।'

'কেন বলুন তো?'

'ছোকরার মতিগতি ভালো নয়।'

'কী-রকম শুনি?'

'বড্ড স্বদেশির দিকে ঝোঁক।'

'তা-ই নাকি?'

'বাস্‌রে, কী-সব গরম-গরম বক্তৃতা করে তা যদি শোনেন! বলে কিনা, একজনের বেশি টাকা থাকবে আর-একজনের কম থাকবে—এ নাকি দারুণ অন্যায়! যাদের অনেক আছে তাদের টাকা কেড়ে নেয়া উচিত, এই হ'লো ওর মত। এ-সব কথা যারা বলে তারা গুণ্ডা ছাড়া আর কী, আপনিই বলুন। বড়োলোক-গরিব নিয়েই তো সংসার।'

ইন্সপেক্টর বললেন, 'হুঁ।'

'আমার খুব সন্দেহ হয় যে এর মধ্যে ওর কোনো হাত আছে। দেখছেন না—আর-সবাই ঘাবড়ে গেছে, অথচ ও দিব্যি বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছে। ক্রিমিনাল না হ'লে এত সাহস হয়!'

'ও তো বাচ্চা ছেলে, ওর পক্ষে কি…



...না—আর তো দেরি করা চলে না—রাত যে ফুরিয়ে এলো।

ভূতের মতো অদ্ভুত

'আপনি পুলিশের লোক হ'য়ে কী বলছেন, সামন্তমশাই! বাচ্চা ছেলেরাই তো যত অঘটন ঘটায়। ওর ঘরটা অন্তত একবার সার্চ করুন—দেখুন না, কী বেরোয়।'

রণজিৎ সামন্ত বললেন, 'বেশ, চলুন।'

পর মুহূর্তে এক কাণ্ড! সরোজ ছুটে এসে একেবারে ইন্সপেক্টরবাবুর পায়ে লুটিয়ে প'ড়ে বললে, 'স্যর, দয়া ক'রে আমাকে ছেড়ে দিন স্যর—আজ বড়োবাবুর মেয়ের বিয়ে—আমি ঠিক সময়ে হাজির না-হ'লে ঠিক আমার চাকরি যাবে।'

ইন্সপেক্টরবাবু সরোজকে টেনে তুলে ধ'রে একটু কঠোরভাবেই বললেন, 'বিয়ে তো রাত্রে, এখন যাবার জন্যে এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?'

'আজ্ঞে আমি তো নিমন্ত্রিত হ'য়ে যাচ্ছি নে, যাচ্ছি খাটতে। আপিশের সব ক'টি কেরানিই তা-ই। আজকের দিনের যত কাজ সব আমাদেরই করতে হবে। সবাই যাবে—আর আমি যাবো না, তাহ'লে কি আর বড়োবাবু আমাকে আস্ত রাখবেন! কোনো ওজর-আপত্তি শুনবেন না তিনি। এ-বাজারে একবার চাকরি গেলে আর চাকরি হবে না, স্যর, না-খেয়ে মরবো, উপোস ক'রে মরবো। আমি মিছে কথা বলছি না, স্যর, বড়োবাবুর বাড়িতে টেলিফোন আছে, আপনি এক্ষুনি খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন। ফোন নম্বর হ'লো...'

কিন্তু সরোজের কথা শেষ হবার আগেই পশুপতিবাবু প্রচণ্ড গলায় ধমকে উঠলেন, 'চুপ করো, সরোজ। আর-একটি কথা বলবে তো তোমাকে একদম হাজতে পুরে রাখা হবে। ভালো চাও তো চুপ ক'রে ব'সে থাকো—এখন কোথাও যাওয়া হবে

না তোমার।' তাঁর কথার ভাবে মনে হ'লো যেন তিনিই পুলিশের বড়ো কর্তা!

তবু সরোজ আর-একবার বললে, 'আমাকে যেতে দিন, আমাকে...' কথা সে শেষ করতে পারলে না, ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

ইন্সপেক্টরবাবু বললেন, 'আপনি যখন এত ক'রে বলছেন তখন আপনাকে যেতে দেবো, কিন্তু তার আগে আপনার ঘরটি একবার সার্চ করবো।'

'অ্যাঁ! আমার ঘর! আমার ঘরে কিছু নেই, আপনার পা ছুঁয়ে বলছি আমার ঘরে কিছু নেই।'

'সে দেখা যাবে।'

এর পরে সরোজ আর-কিছু বললে না, বোধ হয় কথা বলবার ক্ষমতাই তার চ'লে গিয়েছিলো। হাঁটুতে মাথা গুঁজে মেঝের উপরেই সে ব'সে রইলো, থেকে-থেকে তার শরীর কেঁপে উঠতে লাগলো, যেন দমকে-দমকে কান্না আসছে।

পশুপতিবাবু ফিসফিস ক'রে বললেন, 'আগে চলুন আনন্দর ঘরে।' তারপর চেঁচিয়ে আনন্দকে: 'ওহে আনন্দ, ইন্সপেক্টর-বাবু তোমার ঘরটি একবার দেখতে চান।'

আনন্দ খুব সপ্রতিভভাবে বললে, 'বেশ তো, বেশ তো, আমার ঘরে আজ বড়োলোকের পায়ের ধূলো পড়বে—কত ভাগ্য আমার! ওকে ঘর বললে অবশ্যি বেশি বলা হয়, কেননা সেখানে বাস করে ইঁদুর, আরশোলা আর আনন্দ।'

কথাটা মিথ্যে বলেনি আনন্দ, একতলার একটা এঁদো অন্ধকার কুঠুরিতে ওর বাসা। জিনিসের মধ্যে ভাঙা একটা তক্তাপোষ, কেরোসিন কাঠের একটা টেবিল আর একটা রং-

চটা তালা-ছাড়া স্টীল-ট্রাঙ্ক। 'সার্চ' করতে পাঁচ মিনিটও লাগলো না। কয়েকখানা বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক আর বাংলায় লেখা একখানা লেলিনের জীবন-চরিত—এ-ছাড়া আর-কিছুই পাওয়া গেলো না।

বাংলা বইটার মলাট লাল। সেটা একটু নেড়ে-চেড়ে দেখে পশুপতিবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, 'বইটা প্রোস্ক্রাইব্‌ড্ নয় তো?'

ইন্সপেক্টরবাবু বললেন, 'না।…চলুন এবার ঐ কেরানিবাবুর ঘরটা দেখা যাক।'

উপরে এসে দেখা গেলো সরোজ তখনও মেঝের উপর জবুথবু হ'য়ে ব'সে আছে। পশুপতিবাবু হাঁক দিলেন, 'ওহে ওঠো, একবারটি ঘরে যেতে হচ্ছে।'

কলের পুতুলের মতো সরোজ উঠে দাঁড়ালো। তার মুখে এক ফোঁটা রক্ত নেই, ঠোঁট থরথর ক'রে কাঁপছে।

পশুপতি বললেন, 'আপনিও চলুন নরহরি-দা।'

নরহরি বললেন, 'অত ঘাবড়াচ্ছো কেন, সরোজ? তোমার যে কিছু দোষ নেই তা তো সবাই জানি।'

সরোজ নরহরিবাবুর দিকে এমন করুণ দৃষ্টিতে তাকালো যে বলবার নয়।

কিন্তু নরহরিবাবুও অবাক হ'য়ে গেলেন যখন সরোজের ট্রাঙ্কের তলা থেকে পাঁচশো টাকা বেরুলো—কড়কড়ে পাঁচখানা একশো টাকার নোট।

'এর মানে?' বাঘের মতো গর্জন ক'রে উঠলেন পশুপতি। 'তুমি মাইনে পাও পঁচিশ টাকা, চালচুলোর খবর নেই, এত টাকা তোমার হাতে কেমন ক'রে এলো?'

সরোজ চুপ।

পশুপতি বলতে লাগলেন, 'এর একটা জবাবদিহি তো দিতে হচ্ছে, ভায়া!'

সরোজ জিভ দিয়ে একবার ঠোঁট চেটে বললে, 'সত্যি কথাই বলবো, যদিও জানি সে-কথা আপনারা কেউ বিশ্বাস করবেন না।'

'শুনি, শুনি, অবিশ্বাস্যটাই শুনি।'

'টাকাটা আমাকে গোবিন্দবাবু দিয়েছিলেন।'

'কী? কী বললে?'

'গোবিন্দবাবু দিয়েছিলেন। গোবিন্দ চাটুজ্যে।'

'তার চেয়ে বললে না কেন আকাশের পরী ঘুমের মধ্যে তোমার বালিশের তলায় রেখে গেছে!'

'বানিয়ে বললে এমন-কিছু বলতুম যা লোকে বিশ্বাস করবে। কিন্তু সত্যি বলছি ব'লেই অবিশ্বাস্য বলতে হচ্ছে।' সরোজ এতক্ষণ একেবারেই নেতিয়ে ছিলো, কিন্তু সত্যিকার সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে তার বুদ্ধিসুদ্ধি যেন খুলে গেলো।

নরহরিবাবু বললেন, 'আহা—ও যে মিথ্যে বলছে তা তো এখনো প্রমাণ হয়নি। হ'তেও তো পারে। পৃথিবীতে কত কী আশ্চর্য ঘটনা ঘ'টে যাচ্ছে, আর এই কি হ'তে পারবে না!'

পশুপতি বললেন, 'আপনি থামুন নরহরি-দা, ক্রাইম হ্যাণ্ডল্ করা আপনার মতো ভালোমানুষের কম্মো নয়। কী ব্যাপার খুলে বলো, সরোজ—নয়তো কপালে দুর্ভোগ আছে।'

রণজিৎ সামন্ত এগিয়ে এসে বললেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা, আমি ওঁকে জিজ্ঞেস করছি সব কথা···এ-টাকা আপনাকে গোবিন্দ চাটুজ্যে দিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'ধার ?'

'না, আমার মতো গরিবকে ধার দেবে কে ? আমাকে তিনি দান করেছিলেন।'

'তিনি তো ভীষণ কৃপণ ছিলেন—হঠাৎ এতো দয়া কেন হ'লো তাঁর ?'

'কেন হ'লো তা আমি কেমন ক'রে বলবো ?'

'আপনি তাঁর কাছে চেয়েছিলেন ?'

'চেয়েছিলুম। অনেকদিন ধ'রেই চাচ্ছিলুম।'

'কেন ?'

'আমার বোনের বিয়ে দিতে হবে—সেইজন্যে।'

'তারপর কবে পেলেন টাকাটা ?'

'কাল।'

'কাল কখন ?'

'কাল সন্ধেবেলা—আপিশ থেকে ফিরে।'

'কী ব'লে দিলেন তিনি ?'

'ব্যাপারটা এইরকম। আমরা অত্যন্ত গরিব। মা বিধবা, এক বোন আছে, তার বিয়ে দেয়া দরকার। টাকা ছাড়া বিয়ে হয় না। কোথায় পাই টাকা, সব সময় এই আমার ভাবনা। এই মেসে সকলেরই ধারণা যে গোবিন্দবাবুর অনেক টাকা। সেই ধারণারই বশবর্তী হ'য়ে আমি অনেকদিন ধ'রেই গোবিন্দবাবুর কাছে কিছু সাহায্য পাবার চেষ্টা করছিলুম। আজ যেমন আপনার পায়ে ধরেছি তেমনি তাঁরও পায়ে পড়েছি অনেকবার। অনেক কেঁদে-কেটে তাঁর মনটা বোধ হয় একটু ভিজিয়ে এনেছিলুম।'

ভূতের মতো অদ্ভুত

পশুপতি এখানে বাধা দিয়ে ব'লে উঠলেন, 'তাহ'লে তুমি তাঁর ঘরে প্রায়ই যেতে ?'

'তাঁর ঘরে যেতুম বললে ভুল হয়, মাঝে-মাঝে ছাতে দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে কথা কয়েছি বটে।'

'কিন্তু এ-কথা তো আগে কখনো বলোনি !'

'কথাটা কি বলবার মতো ? বোনের বিয়ের জন্য ভিক্ষের চেষ্টা করছি এ-কথা কি পাঁচজনের কাছে ব'লে বেড়াবার মতো ?'

ইন্সপেক্টরবাবু বললেন, 'গোবিন্দবাবুর মন তাহ'লে একটু ভিজেছিলো ?'

'আমার তো তা-ই মনে হয়েছিলো। কিন্তু আমার ধারণা ছিলো তিনি বিশ-পঁচিশ কি বড় জোর পঞ্চাশ টাকা দিয়ে ভিখিরি-বিদেয় করবেন। এদিকে দেশ থেকে মা চিঠি লিখেছেন বোনের একটি ভালো সম্বন্ধ উপস্থিত, কম-সে-কম শো পাঁচেক টাকা হ'লে শুভকার্য এ-মাসেই হ'য়ে যেতে পারে। তাই মরীয়া হ'য়ে ধন্না দিচ্ছিলুম গোবিন্দবাবুর কাছে। কাল সন্ধেবেলা আপিশ থেকে ফিরেই গেলুম তাঁর কাছে। ছাতে দাঁড়িয়ে ডাক দিতেই তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। আমাকে দেখেই মুখ কটমট ক'রে বললেন, "কী চাই ?" আমি তাঁর হাত দুটি জড়িয়ে ধ'রে বললুম, "বোনের বিয়ে ঠিক হ'য়ে গেছে, এ-যাত্রা আমাকে উদ্ধার না করলে চলবে না !" তিনি প্রথমটায় কিছু বললেন না, তারপর হঠাৎ অদ্ভুত একটু হেসে বললেন, "কত চাই ?" আমি ধাঁ ক'রে ব'লে ফেললুম, "পাঁচশো।" "একটু দাঁড়াও", ব'লে তিনি ঘরের ভিতর ঢুকলেন, একটু পরেই বেরিয়ে এসে আমার হাতে কয়েকখানা নোট গুঁজে দিয়ে বললেন, "যাও, এখানে আর

দাঁড়িয়ে থেকো না।” নিচে এসে আমি অবাক হ'য়ে দেখি যে তিনি পাঁচশো টাকাই দিয়েছেন, সত্যি-সত্যি পাঁচশো!'

কথা শেষ ক'রে সরোজ হাঁপাতে লাগলো।

ইন্সপেক্টর জিজ্ঞেস করলেন, 'তখন তাঁর ঘরে কি আলো জ্বলছিলো?'

'হ্যাঁ, জ্বলছিলো।'

'আপনি ঘরের ভিতরটা দেখতে পেয়েছিলেন?'

'তাঁর দরজা তো সব সময় ভেজানো থাকতো।'

'কিচ্ছু ছাখেননি? মনে করবার চেষ্টা করুন।'

সরোজ একটু ভেবে বললে, 'তিনি যখন টাকা আনতে ভিতরে যান, তখন ঘরের ভিতরটা আমার একটুখানি চোখে পড়েছিলো। মনে হয়েছিলো ঘরে যেন আর-একজন মানুষ ব'সে আছে। কিন্তু সে নিশ্চয়ই আমার চোখের ভুল।'

'আচ্ছা, আপনি যখন টাকা চাইলেন তখন তিনি অদ্ভুত একটু হাসলেন, না?'

'হ্যাঁ, অদ্ভুত সে-হাসি। অমন হাসি তাঁর মুখে আমি কখনো দেখিনি।'

পশুপতি ব'লে উঠলেন, 'মিছিমিছি ওকে জেরা করছেন, ইন্সপেক্টরবাবু, ওর সব কথাই বানানো। ও-টাকাটা গোবিন্দ-বাবুর সেটা অসম্ভব নয়, কিন্তু তিনি ওকে তা দান করেছেন এ একেবারেই অসম্ভব। থানায় নিয়ে চলুন, কিল-গুঁতো না-খেলে সত্যি কথা বেরোবে না।'

নরহরিবাবু বললেন, 'কেন, ও যা বলছে তা হ'তেও পারে। আমারও মনে হয় যে গোবিন্দবাবুর বাইরেটা যতই রুক্ষ হোক, ভিতরের মানুষটা ঠিক ও-রকম ছিলো না।'

পশুপতি বললেন, 'দেখুন নরহরি-দা, আপনাকে আমরা সবাই ভালোবাসি, কিন্তু যা বোঝেন না তা নিয়ে কথা বলবেন না দয়া ক'রে। তাহ'লে ইন্সপেক্টরবাবু...'

কিন্তু তাঁর মুখের কথা শেষ হ'লো না। ঝড়ের মতো একজন লোক ঘরের মধ্যে ঢুকে চারদিকে তাকিয়ে বলতে লাগলো, 'এ কি সত্যি? যা শুনছি এ কি সত্যি?...গোবিন্দবাবু...গোবিন্দবাবুকে...কে নাকি...খুন ক'রে গেছে!'

শেষের কথাটি চীৎকার ক'রে ব'লে লোকটি কাঁপতে-কাঁপতে একটা চেয়ারে ব'সে পড়লো। তার চীৎকার এমন অমানুষিক যে তা শুনে সকলের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো।

নয়

আগন্তুক অপরিচিত। দাড়ি-গোঁফ কামানো সুন্দর চেহারা, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি আর দামি শাল, বেশ একটু বাবুগোছেরই বেশবিন্যাস। দু' তিন মিনিট কেউ যেন ভেবে পেলো না তাঁর সঙ্গে কে কথা বলবে, কী কথা বলবে। তারপর পশুপতি গেলেন এগিয়ে। জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কে?'

ভাঙা গলায় আগন্তুক জবাব দিলেন, 'আমি—আমি গোবিন্দবাবুর ভাই, আমার নাম ভুজঙ্গধর।'

'ও—আপনারই আজ আসবার কথা ছিলো! আপনিই পোস্টকার্ড লিখেছিলেন!'

ভূতের মতো অদ্ভুত

'সে পোস্টকার্ড তিনি কি পেয়েছিলেন ?'

'পেয়েছিলেন। তারপর···আজ সকালে উঠে তো আমরা দেখি এই কাণ্ড! কী আর করবেন, মশাই, সবই ভগবানের হাত।' পশুপতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

একটু চুপ ক'রে থেকে আগন্তুক বলতে লাগলেন, 'দশ বছর দাদার সঙ্গে আমার দেখা হয় না, দশ বছর তিনি দেশ-ছাড়া। আর আজ আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাও এলুম—' হাতের উল্টো দিক দিয়ে তিনি কপালে আঘাত করলেন, তাঁর চোখ ছলছল ক'রে উঠলো।

ইন্সপেক্টরবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি এইমাত্র এসে পৌঁছলেন ?'

'হাঁ, এইমাত্র।'

'সঙ্গে কোনো জিনিস নেই ?'

'আছে বইকি। একটা বিছানা আর স্যুটকেস। সেগুলো নিচেই ফেলে এসেছি। শেয়ালদায় নেমে একটা রিকশ নিয়ে এসেছি এখানে। কাছাকাছি এসেই দেখি চারদিকে লাল পাগড়ি। দেখে তো আমার চক্ষুস্থির—বুকের ভিতরটা টিপটিপ করতে লাগলো। আমি মানুষটা একটু ভীতু গোছের, তাছাড়া পাড়াগাঁয়ে থাকি—কোনোরকম হাঙ্গামাই ধাতে সয় না।······আমাকে এক গ্লাশ জল দিতে বলবেন ?'

পশুপতি তৎক্ষণাৎ চেঁচিয়ে বললেন, 'ওরে কেষ্ট, ওরে কে আছিস, এক গ্লাশ খাবার জল নিয়ে আয়।'

জল আনা হ'লো। এক চুমুক জল খেয়ে নিয়ে আগন্তুক আবার বলতে লাগলেন, 'রিকশ এসে দরজায় দাঁড়াতেই শুনলুম আশে-পাশের লোক কী যেন বলাবলি করছে, তার

মধ্যে "খুন" কথাটা স্পষ্ট শুনতে পেলুম। আমি গলা বাড়িয়ে একজনকে জিজ্ঞেস করলুম, "কী হয়েছে, মশাই?" সে বললে, "গোবিন্দ চাটুজ্যে খুন হয়েছে।" সঙ্গে-সঙ্গেই আমার চোখে দিনের আলো নিবে গেলো, পায়ের তলা থেকে মাটি গেলো স'রে। কেমন ক'রে রাস্তায় নেমে, সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলুম তা আমি নিজেই জানিনে। দু' একটা লাল-পাগড়ি বোধ হয় বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু তখন আমার কিছুই খেয়াল ছিলো না। ঐ দেখুন, রিকশভাড়াটা পর্যন্ত দিতে ভুলে গেছি। আর জিনিসগুলো রিকশতেই রয়েছে। দয়া ক'রে ভাড়াটা পাঠিয়ে দেবেন, ব'লে ভুজঙ্গবাবু পকেট মোটা মনিব্যাগ বের ক'রে একটা চকচকে সিকি টেবিলের উপর রাখলেন। সকলেই লক্ষ্য করলে যে ব্যাগটা এতই ভর্তি যে টাকার চাপে যেন একেবারে ফেটে পড়ছে।

পশুপতি বললে, 'আপনার জিনিসগুলোও উপরে আনতে বলি।'

'কোনো দরকার নেই। আমি পরের ট্রেনেই আবার ফিরে যাবো। কলকাতায় যেজন্য এসেছিলাম তা তো চুকেই গেলো।'

ইন্সপেক্টর বললেন, 'একটু বসুন। একটু বিশ্রাম করুন। আপনাকে দিয়ে আমাদের একটু দরকার আছে।'

'আদেশ করুন।'

'আমি এই ব্যাপারটার তদন্তের ভার নিয়েছি। আপনার কাছে গোবিন্দবাবুর ইতিহাস শুনতে চাই, তাতে যদি আমাদের কোনো সাহায্য হয়। আপনি যেটুকু জানেন সেটুকুই বলবেন।'

'নিশ্চয়ই।' ভুজঙ্গধর আর-এক ঢোঁক জল খেয়ে নিলেন।

ভূতের মতো অদ্ভুত

সকলে চারদিকে ঘন হ'য়ে দাঁড়ালো। গোবিন্দ চাটুজ্যের জীবনের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হবে—সকলেই শুনতে উৎসুক।

ভুজঙ্গধর বলতে লাগলেন, 'আমাদের দেশ জয়নগর লাইনে মোতিঝিল গ্রামে। আমরা দু'ভাই। দাদা আমার চেয়ে পাঁচ বছরের বড়ো। ছেলেবেলা থেকে দাদা আমাকে খুব ভালোবাসতেন, আমিও দাদার খুব ভক্ত ছিলুম। বাবা যখন মারা গেলেন আমার বয়েস তখন পঁচিশ। কুসংসর্গে প'ড়ে, কুলোকের পরামর্শে সম্পত্তি নিয়ে দাদার সঙ্গে ঝগড়া বাধালুম। দাদা অনেক বোঝালেন, অনেক সইলেন, মা-ও প্রাণপণ চেষ্টা করলেন আমার মতি ফেরাতে। হায়, তখন যদি তাঁদের কথা শুনতুম!'

ভুজঙ্গবাবু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপ করলেন। ইন্সপেক্টর জিজ্ঞেস করলেন, 'তারপর?'

'এ-ভাবে কিছুদিন কাটলো। তারপর আমি এক ধূর্ত উকিলের সাহায্যে নানারকম আইনের প্যাঁচ কষতে লাগলুম। তখন আমার মাথার ঠিক ছিলো না—দাদাকে যখন-তখন যা-তা বলতুম, নানারকম অপমান করতুম। তারপর একদিন চরম হ'লো। দাদাকে ঘাড় ধ'রে বাড়ির বের ক'রে দিলুম। দাদা সেই যে বাড়ীর বের হ'লেন আর ফিরলেন না। আমি একা বিষয়-সম্পত্তি ভোগ করতে লাগলুম। দাদার শোকে মন-মরা হ'য়ে মা-ও কিছুদিন পর মারা গেলেন। এদিকে আমারও মনে শান্তি ছিলো না। যখনি মাথা ঠাণ্ডা হ'লো, কুসংসর্গ ছাড়লুম, অনুশোচনায় হৃদয় জ্ব'লে যেতে লাগলো। হায় হায়, এ আমি কী করলুম। তারপর আমার জীবন অসহ্য হ'য়ে উঠলো। মনে হ'লো এ-পাপের প্রায়শ্চিত্ত না-করলে আমি বাঁচবো না।

তাই আজ এসেছিলুম কলকাতায়—দাদাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। বিষয়-সম্পত্তি থেকে এতদিনে যত টাকা তাঁর প্রাপ্য হয়েছে সব নিয়ে এসেছিলুম সঙ্গে—সে-টাকা তাঁকে দেবো. তারপর তাঁর পায়ে ধ'রে ক্ষমা চেয়ে তাঁকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাবো। কিন্তু পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা আমার কপালে নেই।'

ইন্সপেক্টর জিজ্ঞেস করলেন,'বাড়ি ছেড়ে তিনি বেরিয়েছেন কতদিন ?'

'তা বছর দশেক হবে।'

পশুপতি ব'লে উঠলেন, 'ঠিক দশ বছরই তিনি এই মেসে আছেন।'

ইন্সপেক্টর আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'এর মধ্যে তিনি আপনাদের খোঁজ-খবর নেননি ?'

'না। তিনি বোধ হয় পণ করেছিলেন বাকি জীবন অজ্ঞাতবাসে কাটাবেন, আমার মুখ আর দেখবেন না—সে-জন্য তাঁকে দোষও দেওয়া যায় না।'

'আপনিও কোনো খবর নেননি।'

'অনেকদিন নিইনি। তারপর মা যখন মারা গেলেন, কলকাতায় এসে খবর নিয়ে জানলুম তিনি এই মেস-এ আছেন। কিন্তু দেখা করবার সাহস হ'লো না—কিংবা ইচ্ছে হ'লো না। একটা পোস্টকার্ড লিখে মা-র মৃত্যুসংবাদটা তাঁকে জানিয়ে দিলুম।'

'সে আজ কতদিনের কথা ?'

ভুজঙ্গবাবু একটু ভেবে বললেন, 'তা সাত বছর হবে।'

'সে-চিঠির তিনি কোনো জবাব দিয়েছিলেন ?'

'না।'

'আর-কোনো চিঠি লিখেছিলেন এই দশ বছরে ?'

'না।'

'আপনি বললেন যে আপনার মা-র মৃত্যুর পর কলকাতায় এসে খোঁজ নিয়ে জানলেন আপনার দাদা এই মেস-এ আছেন। কার কাছে খোঁজ নিলেন ?'

'কেন, তাঁর বন্ধুদের কাছে।'

পশুপতি ব'লে উঠলেন, 'সে কী কথা! তাঁরও বন্ধু-বান্ধব ছিলো তাহ'লে!'

'বলেন কী! ছিলো না! তিনি অত্যন্ত দিল-দরিয়া মিশুক মানুষ ছিলেন যে!'

এ-কথা শুনে উপস্থিত সকলের মধ্যেই খুব একটা চাঞ্চল্য দেখা গেলো। গোবিন্দ চাটুজ্যে দিল-দরিয়া মিশুক মানুষ! এমন অসম্ভব কথা কেউ কি ভাবতে পারে!

পশুপতি বললেন, 'তাহ'লে শেষের দিকে তিনি একেবারে বদলে গিয়েছিলেন, বলতে হয়। আমরা তাঁকে দেখেছি— অত্যন্ত কৃপণ, অতি রুক্ষ মেজাজ, কারো সঙ্গে মেশেন না, কেমন এক অদ্ভুত খাপছাড়া গোছের মানুষ। এই মেসে তিনি একটা প্রবচন দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন।'

আগন্তুক বললেন, 'বুঝেছি। মনের কষ্টে তাঁর ও-রকম হয়েছিলো। আর সে-কষ্ট আমিই তাঁকে দিয়েছিলুম।'

'তাঁর বন্ধুবান্ধব দু' একজনের নাম করতে পারেন ?' জিজ্ঞেস করলেন ইন্সপেক্টর।

'পারবো না কেন ? অমর ঘোষ, বিপিন মুখার্জি—

'কোন অমর ঘোষ ? অ্যাক্টর ?'

'হ্যাঁ, তাঁর কথাই বলছি।'

'তাঁর সঙ্গে তাঁর বন্ধুতা হ'লো কেমন ক'রে ?'

'বাঃ, তিনিও যে অ্যাক্টর ছিলেন।'

'অ্যাক্টর ছিলেন! থিয়েটরে অভিনয় করতেন!' পশুপতি-বাবু যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

'পয়সা নিয়ে করতেন না, শখে করতেন। সেটাই ছিলো তাঁর জীবনের প্রধান শখ। তাঁর বন্ধুরা বলেন যে স্টেজে টিঁকে থাকলে তিনি একজন উঁচুদরের অভিনেতা হ'তে পারতেন।'

'তাঁর বন্ধুরা তাঁকে স্টেজে ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করেননি ?'

'চেষ্টা কি আর কম করেছেন! কিন্তু আমার উপর রাগ ক'রে সমস্ত জীবনের উপরেই তিনি অভিমান ক'রে ছিলেন। বন্ধু-বান্ধব এলে শেষটায় আর দেখাও করতেন না। অগত্যা তাঁরা হাল ছেড়ে দিলেন। তাঁর কাছে কেউ আর আসতো না, তিনিও অবশ্য কোনোখানেই বেরোতেন না। ক্রমে লোকে তাঁর অস্তিত্বই ভুলে গেলো।'

'তিনি বিয়ে করেছিলেন ?'

'না। বিয়ে করলে কি আর নিজের উপর এত নিষ্ঠুর হ'তে পারতেন!'

হঠাৎ নরহরিবাবু ব'লে উঠলেন, 'তিনি অ্যাক্টর ছিলেন! তাই বলো! তাই থিয়েটরের কথা উঠলেই তাঁর যা একটু উৎসাহ দেখা যেতো।'

'আর তাঁর ঘরেও কয়েকটা নাটকের বই পাওয়া গেছে তা তো জানেন।'

নরহরি বললেন, 'কিন্তু—আমি তো বলতে গেলে থিয়েটরের পোকা, গত বিশ বছর এই কলকাতা শহরের কোনো নাটকই

প্রায় বাদ দিইনি। কিন্তু গোবিন্দ চাটুজ্যে নামে কোন অ্যাক্টর তো মনে পড়ে না।

ভুজঙ্গবাবু বললেন, 'স্টেজে যে তাঁর ছদ্মনাম ছিলো। তাঁর মত ছিলো যে গোবিন্দ নামটা এত সেকেলে যে স্টেজের মোটেও উপযোগী নয়। তাঁর স্টেজের নাম ছিলো মণি দত্ত।'

নরহরি সঙ্গে-সঙ্গে ব'লে উঠলেন, 'মণি দত্ত! তাই বলুন। মণি দত্তের অভিনয় আমার মনে আছে বইকি! বছর পনেরো আগে সরস্বতী থিয়েটরে তাঁর কর্ণের অভিনয় দেখে মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিলুম। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক মনে পড়েছে। তারপর হঠাৎ মণি দত্তকে আর থিয়েটরে দেখা যায় না। আমি অনেক সময় ভেবেছি যে লোকটার কী হ'লো। অনেককে জিজ্ঞেসও করেছি—কিন্তু কোনো কূল-কিনারা পাইনি। কী আশ্চর্য, সেই মণি দত্তই এই গোবিন্দ চাটুজ্যে!...কিন্তু...কিন্তু মণি দত্ত তো চমৎকার সুপুরুষ ছিলেন।'

'তার মানে? আপনি কি বলতে চান আমার দাদা দেখতে খারাপ ছিলেন?'

'মুখ ভরা দাড়ি গোঁফের জঙ্গল, একটা চোখ কানা, কপালে মস্ত আঁচিল—এ-চেহারাকে ঠিক সুশ্রী বলা যায় না।'

ভুজঙ্গধর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'কী যেন, পরে হয়তো তিনি ঐরকম দেখতে হয়েছিলেন। আমরা তো তাঁকে ও-রকম দেখিনি। হয়তো চোখের কোনো অসুখ করেছিলো। দাড়ি-গোঁফ ইচ্ছে ক'রেই রেখেছিলেন—এ-মানুষ যে সেই মানুষ সে-কথা নিজেও যেন ভুলে থাকতে পারেন।'

'এই দশ বছরের মধ্যে আপনি কি তাঁকে একবারও ছাখেননি?'

'না।'

'তাঁর এখানকার খরচ কী ক'রে চলতো অনুমান করতে পারেন?'

'কী ক'রে বলবো! হয়তো নিজের কিছু টাকা ছিলো সেটা নিয়ে এসেছিলেন, তাই দিয়েই চালাতেন।'

'খরচও তো ছিলো তাঁর মাসে পাঁচ টাকার বেশি না', বললেন পশুপতি।

ভুজঙ্গ বললেন, 'হয়তো বাধ্য হ'য়েই ও-রকম চালে চলতে হ'তো।'

ইন্সপেক্টর বললেন, 'অথচ এখানে এই ভদ্রলোক বলছেন যে কাল সন্ধেবেলা তিনি এঁকে পাঁচশো টাকা দান করেছিলেন—বোনের বিয়ে দেবার জন্য।'

ভুজঙ্গধর আস্তে-আস্তে বললেন, 'অসম্ভব নয়। তাঁর হাতে টাকা থাকলে তিনি অমনি ক'রেই বিলিয়ে দিতেন, ঐরকমই তাঁর স্বভাব ছিলো। আপনারা তাঁকে যত কৃপণ ব'লেই জানুন, আসল মানুষটা তিনি ছিলেন একেবারে উল্টো।'

সরোজ বললে, 'আমি হলফ ক'রে বলছি এ-টাকা আপনার দাদা আমাকে দান করেছিলেন। আপনি যদি ফেরৎ চান এক্ষুনি ফেরৎ দেবো, কিন্তু আমি যা বলছি তার এক বিন্দুও মিথ্যে নয়।'

ভুজঙ্গ বললে, 'আমি তো আপনার কথা অবিশ্বাস করছি না। আর আপনার টাকা আমি কেন ফেরৎ নেবো? দাদাকে অনেক ঠকিয়েছি, তিনি যদি নিজের ইচ্ছায় কাউকে কিছু দিয়ে থাকেন সেটুকুই আমার সান্ত্বনা।'

ইন্সপেক্টর বললেন, 'কিন্তু আপনি যা বলছেন সে-অনুসারে



সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চল যে কাণ্ড করলো তাতে দু'জনেই হাঁ-হাঁ ক'রে ছুটে গেলেন·

তো তাঁর হাতে পাঁচশো টাকা থাকবার কথা নয়। যিনি পয়সার অভাবে অত কষ্ট ক'রে থাকতেন, তাঁর পক্ষে অত টাকা দান করা কি সম্ভব?'

'অসম্ভব কেমন ক'রে বলবো? তাঁর হাতে ঠিক কত টাকা ছিলো তা তো আমি জানি না, হয়তো ছিলো কিছু টাকা।'

নরহরিবাবু ভুজঙ্গধরের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আশ্চর্য, আপনাদের দু'ভাইয়ের চেহারায় একটু মিল নেই। শুধু কপালের কাছটায় একটু যেন মেলে।'

পশুপতি বললেন, 'কিন্তু গলার স্বর একেবারে একরকম, তাই নয়?'

ভুজঙ্গধর ক্লান্তভাবে বললেন, 'ভাইয়ে-ভাইয়ে ও-রকম হয়।'

দশ

রণজিৎ সামন্ত বললেন, 'অনেক ধন্যবাদ, ভুজঙ্গবাবু। আপনি যে-রকম সরলভাবে সমস্ত ঘটনা বললেন তা আমার সত্যি খুব ভালো লাগলো। এখন চলুন আপনার দাদাকে একবার দেখে আসবেন।'

এ-কথা শুনেই ভুজঙ্গবাবুর মুখ যেন এক অবর্ণনীয় যন্ত্রণায় বিকৃত হ'য়ে উঠলো। অতি কষ্টে তিনি বললেন, 'আমার যাওয়া কি···একান্তই দরকার?'

'চলুন একটু দেখবেন।'

'চলুন।' ভুজঙ্গবাবু উঠে দাঁড়ালেন। তাঁকে দেখে

নরহরিবাবুর মনে হ'লো যে দুঃখময় হতাশার এমন মূর্তি তিনি কখনো ছাখেননি। ভুজঙ্গবাবুর চেহারা সত্যি ভালো ; কিন্তু তাঁর নিখুঁত ক'রে আঁচড়ানো চুল আর অমন পরিপাটি সাজ-সজ্জার ভিতর দিয়েও তাঁকে এমন উদ্‌ভ্রান্ত এমন দুঃখী দেখাচ্ছিলো যে শুধু নরহরিবাবুর নয়, উপস্থিত অনেকেরই মৃত ব্যক্তির চাইতে এই অনুতপ্ত দোষী ভাইটির জন্য কষ্ট হচ্ছিলো বেশি।

ইতিমধ্যে চাকর ভুজঙ্গবাবুর বিছানা আর স্যুটকেস ঐ ঘরেই এনে রেখেছিলো! সেদিকে হঠাৎ চোখ প'ড়ে ইন্সপেক্টরবাবু ব'লে উঠলেন, 'বাঃ, আপনার স্যুটকেসটা ভারি নতুন ধরনের তো!'

'হ্যাঁ, এটা নতুন কিনেছিলুম। আর এটাতে ভ'রে কী এনেছিলুম, জানেন? দাদার জন্যে কাপড়-চোপড়। এই দেখুন'—ব'লে ভুজঙ্গবাবু চাবি বের ক'রে স্যুটকেস খুলে ফেললেন। ভিতরে দেখা গেলো পর-পর ভাঁজ করা অনেক কাপড়-জামা—দামি-দামি তাঁতের ধুতি, সিল্কের পাঞ্জাবি, গরম জামা—সবই আনকোরা নতুন। সেগুলোর উপর আস্তে একবার হাত বুলিয়ে ভুজঙ্গবাবু বললেন, 'এই ক'বছরে যত পূজোর কাপড় ষষ্ঠির কাপড় দাদার পাওয়া উচিত ছিলো, সব একসঙ্গে কিনে এনেছিলুম, তাছাড়া জামাও অনেকগুলো। ভেবেছিলুম তিনি ক্ষমা করবেন, ফিরে আসবেন। কিন্তু...' ভুজঙ্গবাবুর কথা শেষ হ'তে পারলো না, তাঁর গলা আটকে এলো, টপটপ ক'রে কয়েক ফোঁটা চোখের জল ঝ'রে পড়লো।

একটু চুপ ক'রে থেকে রণজিৎবাবু বললেন, 'চলুন তাহ'লে একবার উপরে। আপনিও চলুন ম্যানেজরবাবু—আর নরহরিবাবু, আপনিও আসতে পারেন।'

ভূতের মতো অদ্ভুত

উপরে যাবার সিঁড়ির কাছে হঠাৎ দেখা গেলো চঞ্চলকে।

রণজিৎবাবু বললেন, 'চঞ্চল, এতক্ষণ কোথায় ছিলে?'

'এখানেই তো ছিলুম।'

'তোমাকে অনেকক্ষণ দেখিনি মনে হচ্ছে।'

'না, এখানেই ছিলুম।'

রণজিৎ চেঁচিয়ে বললেন, 'আপনারা এগোন, আমি আসছি।' তারপর চঞ্চলের সঙ্গে চুপি-চুপি মিনিট দুয়েক কী কথা বললেন। তিনি যখন উপরে এলেন, চঞ্চলও এলো তাঁর সঙ্গে।

ঘরে ঢুকে দাদার বীভৎস মৃতদেহ দেখে ভুজঙ্গবাবু একেবারে আকুল হ'য়ে পড়লেন। দু'হাতে মুখ ঢেকে অঝোরে কাঁদতে লাগলেন তিনি, তাঁর অবস্থা দেখে নরহরিবাবুরও চোখে জল এলো।

ইন্সপেক্টরবাবু বলতে লাগলেন, 'অত অধীর হবেন না, ভুজঙ্গবাবু, একটু ধৈর্য ধরুন, একটু শান্ত হবার চেষ্টা করুন।'

কিন্তু ভুজঙ্গবাবু আরো ফুলে-ফুলে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। খানিক পরে অনেক চেষ্টা ক'রে বললেন, 'আমি এখন যাই। এ-দৃশ্য আমি আর সইতে পারিনে।'

'আর একটু অপেক্ষা করুন। অন্যরকম একটা দৃশ্য দেখে যান' ব'লে ইন্সপেক্টর চঞ্চলকে কী ইঙ্গিত করলেন। সঙ্গে-সঙ্গে চঞ্চল যে-কাণ্ড করলো তাতে নরহরি আর পশুপতি দু'জনেই হাঁ-হাঁ ক'রে ছুটে গেলেন, কিন্তু তাঁরা কেউ বাধা দেবার আগেই চঞ্চল মেঝের উপর হাঁটু গেড়ে ব'সে প'ড়ে মৃতদেহের গাল থেকে দাড়িগুলো পটপট ক'রে ছিঁড়ে ফেলতে লাগলো, তারপর ঘরের কোণ থেকে জলের বালতি, সাবান আর স্পঞ্জ নিয়ে এসে (এগুলি সে আগেই এনে রেখেছিলো) মৃতদেহের মুখের

উপর খুব জোরে স্পঞ্জ ঘষতে লাগলো। উড়ে গেলো কপালের আঁচিল, কানা চোখ ভালো হ'য়ে গেলো, পাঁচ মিনিটের মধ্যে দাড়ি-গোঁফ-কামানো সুশ্রী একটি মুখ ফুটে উঠলো, তাতে নিষ্ঠুর মৃত্যুর চিহ্ন তখনো স্পষ্ট, কিন্তু তাকে গোবিন্দ চাটুজ্যের মুখ ব'লে চেনবার কোনো উপায়ই আর নেই।

নরহরি আর পশুপতি রুদ্ধশ্বাস বিস্ময়ে এই দৃশ্য দেখলেন।

আর ভুজঙ্গ?

তাঁর মুখ ততক্ষণে মৃত ব্যক্তির মুখের চেয়েও বীভৎস হ'য়ে উঠেছে। বড়ো-বড়ো চোখ যেন কপাল থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে, ঠোঁট ঝুলে পড়েছে, সমস্ত শরীর থরথর ক'রে কাঁপছে। একবার তিনি দরজার দিকে তাকালেন—দরজা থেকে সিঁড়ি পর্যন্ত আগাগোড়া লাল পাগড়িতে ভরা। আর একবার তাকালেন অন্যদিকে, ইন্সপেক্টর রণজিৎ সামন্তর কঠোর দৃষ্টি তাঁর মুখের উপর পড়লো।

ইন্সপেক্টরবাবু খুব স্পষ্ট উচ্চস্বরে বললেন, 'দেখুন আপনারা, এই আমার পাশে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন তিনি আপনাদের চিরপরিচিত গোবিন্দ চাটুজ্যে, আর মেঝের উপর ম'রে প'ড়ে আছে তাঁর ভাই ভুজঙ্গধর। কাল রাত্রে গোবিন্দ চাটুজ্যে তাঁর ভাইকে এই ঘরে গলা টিপে মেরে ফেলেন—গোবিন্দবাবুর সাধ্য থাকে তো এর প্রতিবাদ করুন।'

এই কথাগুলি শুনে নরহরি আর পশুপতির শরীর যেন পাথরের মূর্তিতে পরিণত হ'লো, আর ইন্সপেক্টরবাবু যাঁকে গোবিন্দবাবু ব'লে সম্বোধন করলেন তিনি কাঁপতে-কাঁপতে মেঝের উপর ব'সে প'ড়ে হাঁটুর মধ্যে মুখ ঢাকলেন।

*   *   *   *

ভূতের মতো অদ্ভুত

ইন্সপেক্টর রণজিৎ সামন্ত বলতে লাগলেন ঃ

'গোবিন্দবাবু, আপনার অভিনয় অতি চমৎকার হয়েছিলো। ঐ ঘরে হঠাৎ এসে যখন ঢুকলেন তখন থেকে এ-ঘরে এসে মৃতদেহ দেখে কেঁদে ওঠা পর্যন্ত সবই অতি নিখুঁত হয়েছে। আপনি যে অতি নিপুণ অভিনেতা তা আপনি ব'লে না-দিলেও আমরা বুঝতে পারতুম। আর আপনি যে কায়দা ক'রে আপনার ব্যাগের টাকা আর নতুন স্যুটকেসের নতুন জামা-কাপড়গুলি আমাদের দেখিয়ে দিলেন তার জন্যেও আপনাকে বাহবা দিই। আপনি ভেবেছিলেন যে ও-রকম ক'রেই সন্দেহের হাত এড়াতে পারবেন। হয়তো পারতেন, কিন্তু তার আগেই আমি একটা আবিষ্কার ক'রে ফেলেছিলুম যেটা আপনার পক্ষে মারাত্মক। প্রথম যখন আমরা এ-ঘরে আসি তখন আমি মৃতদেহের মুখে হাত দিতেই অল্প একটু রং আমার আঙুলে লেগে গিয়েছিলো। আমি লক্ষ্যই করিনি, এই চঞ্চলই সেদিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আপনার মেক্-অপ বাস্তবিকই প্রশংসনীয়, কিন্তু একটা জায়গায় রংটা একটু কাঁচা ছিলো। অবশ্য আঙুলে ঐ একটু রঙের দাগ আমরা হয়তো গ্রাহ্য করতুম না, কিন্তু চঞ্চল কলতলায় গিয়ে দেখলো একটা ঘটির গায়েও একটু রং লেগে আছে। ঠাকুর বলেছিলো, অনেক রাত্রে সে কলতলায় জলের শব্দ শুনতে পেয়েছিলো, আপনি তখন এই পৈশাচিক কর্ম সেরে হাত ধুচ্ছিলেন। তারপর আপনি ঘর ছেড়ে যাবার সময় আলো নেবাতে ভুলে' গিয়েছিলেন, দেখা গেলো আলোটা অত্যন্ত বেশি উজ্জ্বল। এতটুকু ঘরে একশো পাওয়ারের আলো দিয়ে গোবিন্দ চাটুজ্যের কী দরকার ? আবার অত্যন্ত দামি একটি আয়নাই

বা কেন? বাক্সে নাটকের বই, থিয়েটর সম্বন্ধে আলাপে উৎসাহ। এতে কী বোঝা গেলো? এককালে গোবিন্দবাবুর হয়তো থিয়েটরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিলো। হয়তো তিনি অভিনেতা ছিলেন। তাহ'লে মেক্-অপের বিদ্যে নিশ্চয়ই তাঁর জানা আছে? যদিও আপনার রং-তুলি ইত্যাদি সরিয়েছিলেন, কিন্তু আয়নাটা ছিলো, একশো পাওয়ারের আলো ছিলো। গোবিন্দবাবুর চেহারা অতি বিকট, কিন্তু সেটা তাঁর সত্যি চেহারা তো? যে-রকম রহস্যময় মানুষ, হয়তো কোনো কারণে অজ্ঞাতবাস করছেন, হয়তো ও-মুখ তাঁর মুখই নয়, মেক-অপ-করা মুখোস। নকল দাড়ি প'রে, নকল আঁচিল বসিয়ে, নকল কানা চোখ নিয়ে আছেন। সেইজন্য ঘরের মধ্যে কাউকে ঢুকতে দেন না, ঠাকুর-চাকরকেও না। কখনও স্নান করেন না তাও একই কারণে। সব সময় মেক্-অপ ক'রে সেজে থাকা কষ্টকর, শুনতে অসম্ভব শোনায়, কিন্তু এটাই তাঁর অভ্যেস দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো। কেমন, তা-ই নয়?'

গোবিন্দবাবু মুখ তুলে একবার তাকালেন, তারপর আবার চোখ নামালেন।

'তারপর এই খুনের ব্যাপার। আপনার ভাই আসবে এই খবর কাল পেয়েছিলেন এবং ঠাকুরকে খাবার ব্যবস্থা রাখতে বলেছিলেন। কিন্তু কোনো কারণে সে কাল বিকেলেই এসে পড়েছিলো, মেসের কেউ তা লক্ষ্য করেনি। সরোজবাবু যখন সন্ধেবেলা আপনার কাছে টাকা চাইতে যান, তখন ঘরে আপনার ভাই ব'সে ছিলো—কেমন, তা-ই নয়? সরোজবাবু তাকে দেখেছিলেন, কিন্তু আপনার ঘরে অন্য লোক থাকা এতই অসম্ভব যে তিনি সেটা চোখের ভুল মনে ক'রে উড়িয়ে

দিয়েছিলেন। সরোজবাবুকে পাঁচশো টাকা আপনি কেন দিয়েছিলেন আপনিই জানেন। আবার তারই কয়েক ঘণ্টা পরে আপনার মায়ের পেটের ভাইয়ের বুকের উপর চ'ড়ে ব'সে গলা টিপে তাকে হত্যা করলেন কেন তাও আপনিই বলতে পারবেন। মৃতদেহের মুখ ঠিক নিজের মুখের মতো ক'রে মেক্-অপ করলেন, তাকে পরালেন নিজের জামা-কাপড়, তারপর কলতলায় হাত ধুয়ে আস্তে-আস্তে বেরিয়ে গেলেন। তারপর নতুন জামাকাপড় জুতো কিনলেন, চুল ছাঁটালেন, নতুন স্যুটকেসে নতুন কাপড় ভ'রে নতুন হোল্ডলে নতুন বিছানা বেঁধে গোবিন্দবাবুর ভাই ভুজঙ্গধর সেজে এসে উঠলেন এই মেসে। ভাইয়ের আজ সকালেই আসবার কথা, সুতরাং কেউ কিছু সন্দেহ করতো না। আর যারা আপনার মেক্-অপ করা মূর্তি শুধু দেখেছে তাদের পক্ষে অবশ্য আপনাকে দেখে চেনা একেবারেই অসম্ভব। মৃতদেহের মেক্-অপও পোস্টমর্টেমে ধরা পড়তো না—দাড়িটা আসল না নকল তার বিচার করা পোস্টমর্টেমের উদ্দেশ্য নয়। আপনার সব চালই ঠিক হয়েছিলো, তবু ধরা প'ড়ে গেলেন। নেহাৎই দৈবক্রমে, বলতে পারেন। আমার হাতে একটুখানি রং লেগে না-গেলে এদিকে আমার কল্পনাই কখনো যেতো না। আর, একবার যখন ও-রকম একটা সন্দেহ হ'লো তখন দেখলুম পর-পর সব মিলে যাচ্ছে—আয়না, জোরালো আলো, নাটকের বই, আপনার পরনে নতুন জামা-কাপড়, আপনার অতি চমৎকার কথাবার্তা, নিখুঁত অঙ্গভঙ্গি—জানেন, আপনার কথা শুনতে-শুনতে আমার ঠিক মনে হচ্ছিলো নাটক দেখছি। অনেকদিন স্টেজে নামেন না বটে, কিন্তু আপনার শক্তি লোপ পায়নি, আজ যা অভিনয়

করলেন আমি তো তা ভুলতে পারবো না। গোবিন্দবাবুর ভাই ব'লে যিনি পরিচয় দিচ্ছেন তাঁর যে কপালের কাছটায় গোবিন্দবাবুর সঙ্গে মিলবে আর গলার স্বর একেবারেই একরকম হবে তাতে অবাক হবার কিছু নেই, কিন্তু এও ভাবতে হ'লো যে গোবিন্দবাবুর মুখ তো কপাল বাদ দিয়ে দাড়িগোঁফেই ঢাকা, অন্য কোথাও মিললেই বা বোঝা যাবে কেমন ক'রে?

'আমার যা বলবার তা তো বললুম। এখন আপনি বলুন, গোবিন্দবাবু, কেন এই নৃশংস কাণ্ড করতে গেলেন।'

এগার

গোবিন্দ চাটুজ্যের জবানবন্দি ঃ

'হাতকড়া? না, দরকার নেই। আমি পালাবো না। আমি ফাঁসি যাবো। বাঁচবার চেষ্টা করেছিলুম। তা যখন ব্যর্থ হ'লো তখন আমার আর বাঁচবার ইচ্ছে নেই। এখন মরলেই বাঁচি।

'ভুজঙ্গধর সেজে আপনাদের যা বলেছিলাম তার অনেক কথাই সত্যি। আমাদের গ্রামের নাম ঠিকই মোতিঝিল। সত্যি আমরা দু' ভাই। ভুজঙ্গ ছোটো। বাবা মারা গেলেন অনেক টাকা রেখে। সে-টাকায় আমাদের দু'ভায়েরই সমান অংশ। কিন্তু আমার মাথায় দুর্বুদ্ধি চাপলো, আমি ওকে ঠকিয়ে সব টাকা মেরে দিলুম। কেমন ক'রে ঠকালুম সে-সব না-ই বা শুনলেন।

'ভুজঙ্গ ছিলো মিনিমুখো ভালোমানুষ। আমাকে কিছু

বললে না, অভিমান ক'রে চ'লে গেল আসামে চায়ের বাগানে চাকরি নিয়ে। মা-ও আমার উপর রাগ ক'রে গেলেন ওর সঙ্গে। একা বাড়িতে ব'সে ব'সে আমার মন ভারি খারাপ হ'য়ে গেলো। ভাবলুম, এ কী করলুম! সুখের সংসার ছার-খার ক'রে দিলুম!

'ভুজঙ্গকে চিঠি লিখলুম ফিরে আসতে। সে জবাব দিলে না। মা-কে লিখলুম, তিনিও নীরব। তখন নিজের উপর ধিক্কার এলো, তীব্র অনুশোচনায় হৃদয় জ্বলতে লাগলো। কলকাতায় এসে কুসংসর্গে প'ড়ে অনেক টাকা ওড়ালুম। কিন্তু মন কিছুতেই শান্ত হয় না।

'হ্যাঁ—আমার থিয়েটরে শখ ছিলো, এককালে ছিলুম নাম-জাদা অভিনেতা। তাছাড়া মেক্-অপে আমার হাত খুব ভালো ছিলো। টিকে থাকলে লন চ্যানির জুড়ি হ'তে পারতুম। আর-একটা শখ আমার ছিলো—তাসের ব্রিজখেলা। একবার সমস্ত কলকাতার চাম্পিয়ন হয়েছিলুম, আমার জুড়ি ছিলো অ্যাক্টর অমর ঘোষ।

'সে-সব দিন আমার কী সুখেই কেটেছে! কিন্তু ভাইকে ঘরছাড়া করবার পর থেকে আমার মনে আর সুখ ছিলো না। কোনো ভালো কাজে মন দিতে পারিনে—নিতান্ত বাজে খেয়ালে পয়সা ওড়াই। এ ভাবে যখন প্রায় অর্ধেক টাকা উড়িয়ে দিয়েছি তখন মনে হ'লো আর না! আর যা আছে রেখে দেবো ভুজঙ্গের জন্য; যদি কোনোদিন ও আমাকে ক্ষমা করে, যদি কোনোদিন ফিরে আসে তাহ'লে ওর হাতে তুলে দেবো।

'পাপ করেছিলুম, এবার শুরু হ'লো তার প্রায়শ্চিত্ত। উঃ,

ভূতের মতো অদ্ভুত

কী কঠোর কৃচ্ছ্র সাধন! মেক্-অপ ক'রে মুখটা যথাসম্ভব কুৎসিত ক'রে উঠলুম এসে এই মেসের চারতলার চিলকোঠায়। আমার সুন্দর মুখ আমাকে যেন সব সময় ব্যঙ্গ করতো—যার অন্তর অত নোংরা, তার মুখ সুন্দর হওয়া কি উচিত? আমার বাইরের চেহারা আমার ভিতরের চেহারার মতোই ভয়াবহ হবে এই ছিলো আমার পণ। আয়নায় নিজের বিকট মূর্তি দেখে খানিকটা যেন ভালো লাগতো। যতদিন প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ না হয়, এই আমার ছদ্মবেশ। এর জন্য কী কষ্টই না আমি করেছি! দশ বছরের মধ্যে একটা দিন ভালো ক'রে নাইতে পারিনি। কারো সঙ্গে মিশতে পারিনি, কথা বলতে পারিনি, আমার অভিশপ্ত শুষ্ক জীবন নিয়ে একা প'ড়ে রয়েছি ঐ চার-তলায়। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সম্পর্ক চুকলো, জগতের সঙ্গে সম্পর্ক চুকলো। বেঁচে ম'রে থাকা কাকে বলে তা বেশ ভালো ক'রেই বুঝলুম।

'আমি,গোবিন্দ চাটুজ্যে, অ্যাক্টর মণি দত্ত, একদা যে দু'হাতে টাকা উড়িয়েছি, আমি অকস্মাৎ ঘোরতর কৃপণ হ'য়ে উঠলুম। মনে হ'তো একটা পয়সা বাঁচলে ভুজঙ্গর একটা পয়সা বাড়লো। গল্প নয়—সত্যি আমার মাসিক খরচ পাঁচ টাকার বেশি ছিলো না। টাকাগুলো সব নিজের কাছেই রাখতুম—ব্যাঙ্কে রাখতুম না, হঠাৎ ম'রে গেলে ভুজঙ্গ হয়তো সে-টাকা আর খুঁজে পাবে না। তাছাড়া কোনোদিন নিজে ওর হাতে সব টাকা তুলে দেবো এও আমার একটা ইচ্ছে ছিলো।

'একদিন ভুজঙ্গর একটা পোস্টকার্ড এলো—মা মারা গেছেন। সুদ্ধু এই খবরটি—আর কিচ্ছু না। এই মেসের ঠিকানা আমিই অবশ্য ওকে জানিয়েছিলুম।

'বুঝলুম মা আমাকে ক্ষমা না-ক'রেই চ'লে গেলেন। ভাইও পাষাণ। ক্রমে আমার অন্তর-মন সবই যেন বদ্‌লে যেতে লাগলো। আমি অত্যন্ত নিষ্ঠুর রুক্ষ প্রকৃতির হ'য়ে উঠলুম—হবোই না বা কেন ? এই পৃথিবীর আমি কে, এই জীবনের সঙ্গে কোনোখানে আমার একটা বন্ধন নেই। আত্মহত্যা করতে পারতুম—তা যে করিনি সুদ্ধ এই আশায় যে হয়তো কোনোদিন আবার ভুজঙ্গর সঙ্গে দেখা হবে, হয়তো শেষ পর্যন্ত সে আমাকে ক্ষমা করতে পারবে।

'কিছুদিন আগে অত্যন্ত অনুনয় ক'রে তাকে একখানা চিঠি লিখেছিলুম একবার আসতে। কাল সকালে হঠাৎ পোস্টকার্ড পেলুম সে সত্যি-সত্যি আসছে। মন আনন্দে নেচে উঠলো। এতদিনের অভিমান তাহ'লে ভাঙলো। কালকের দিনটা যে কী-রকম একটা অধীর আগ্রহে কাটিয়েছি তা কাউকে বোঝাতে পারবো না।

'আজ সকালে আসবার কথা, হঠাৎ কাল সন্ধ্যার একটু আগেই সে এসে হাজির। মুগ্ধচোখে তার দিকে রইলুম চেয়ে। সে আমাকে দেখে বললে, "দাদা, তুমি ও-রকম চেহারা করেছো কেন ?" আমি বললুম, "তোর জন্যে"।

'একটু পরেই সরোজবাবু গেলেন আমার কাছে টাকা চাইতে। দিয়ে দিলুম তাঁকে পাঁচশো টাকা। মনে-মনে বললুম, "ওরে গোবিন্দ, আজ থেকেই তোর নবজীবন শুরু হোক। কাল থেকে তো তুই মুক্ত। কাল থেকে তুই আবার মানুষ, আবার জীবন্ত !" সমস্ত পাপের বোঝা এবার নামিয়ে দেবো। ভুজঙ্গকে সব টাকা গছিয়ে দিয়ে আমি আমার পথ ধ'রবো। যে-পথ মুক্তির, যে-পথ আনন্দের।

'ভুজঙ্গ অনেক ভালো-ভালো খাবার নিয়ে এসেছিলো। ও তা-ই খেলো। আমি মেসের খাবারই খেলুম। অনেকদিন ভালো খেয়ে অভ্যেস নেই, হয়তো হঠাৎ সইবে না, এই মনে ক'রে ভুজঙ্গর অনেক পিড়াপিড়িসত্ত্বেও ও যা এনেছিলো তার কিছুই খেলুম না। খাওয়ার পর আলো নিবিয়ে ওকে আমার প্রাণের সব কথা খুলে বললুম। ও বললে, "দাদা, কালই আমি চ'লে যাবো, তুমিও যাবে তো আমার সঙ্গে?" আমি বললুম, "পাগল! আমি কাল থেকে মুক্ত। আর আমি তোদের জড়াবো না, তোরাও আমাকে আর জড়াসনে।" তবু সে বার-বার বলতে লাগলো, "না, দাদা, তোমাকেও যেতে হবে। তুমি আমার কাছেই থাকবে এখন থেকে।" আমি হেসে বললুম —কতকাল পরে যে একটু হাসলুম!—"আচ্ছা আচ্ছা, সে হবে।"

'ঐ ছোট্ট ঘরে মেঝেতে বিছানা পেতে দু'জনে পাশাপাশি ঘুমিয়ে পড়লুম। ও বিছানা আনেনি, আমার বিছানা ওকে দিলুম, আমি প'ড়ে রইলুম মাদুরে। অনেক রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে শুনি ভুজঙ্গ অঘোর ঘুমে গভীর নিঃশ্বাস ফেলছে। মনে-মনে বলতে লাগলুম—কাল থেকে আমার নতুন জন্ম, কাল থেকে আমার নতুন জন্ম! আহা, যদি একেবারে নতুন হ'তে পারতুম, একেবারে নতুন হ'য়ে জন্মাতে পারতুম! এমন যদি হ'তো যে গোবিন্দ চাটুজ্যে ব'লে কেউ আর রইলো না, অথচ আমি রইলুম, তাহ'লে কী চমৎকারই হ'তো। ঐ তো ভুজঙ্গ কেমন অঘোরে ঘুমুচ্ছে। আমি যদি ভুজঙ্গ হ'তে পারতুম—যে কখনো কোনো অন্যায় করেনি, যার মনে কোনো পাপ নেই! তা কি সম্ভব হয় না? কোনোরকমেই সম্ভব হয় না?

ভূতের মতো অদ্ভুত

'কথাটা ভাবতে-ভাবতে আমার মাথা গরম হ'য়ে গেলো, আমি মাদুরের উপর উঠে বসলুম। তারপর হঠাৎ আমার মাথায় এই বুদ্ধি এলো। এর চেয়ে সহজ কিছুই নয়। মা মারা গেছেন, ভুজঙ্গ বিয়েও করেনি, আমাদের নিকট কোনো আত্মীয়ও আর নেই—কে জানবে যে আমি ভুজঙ্গ নই! কে জানবে? কেউ না। এ আমার এক রকম আত্মহত্যা—অদ্ভুত আত্মহত্যা বলতে পারেন। গোবিন্দ চাটুজ্যেকে আমি হত্যা করবো, তার নাম মুছে দেবো জগৎ থেকে—কাল থেকে আমি, ভুজঙ্গধর চাটুজ্যে, নির্মম নিষ্পাপ মুক্ত জীবনের অধিকারী হবো। আনন্দে, উত্তেজনায়, নিষ্ঠুর সংকল্পে আমার সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগলো।

'তবু আমি অনেকক্ষণ ঘুমন্ত ভুজঙ্গর পাশে চুপ ক'রে ব'সে রইলুম। হঠাৎ ঢং-ঢং ক'রে কোথায় তিনটে বাজলো, সেই শব্দে চমকে উঠলুম। না—আর তো দেরি করা চলে না—রাত যে ফুরিয়ে এলো। তখন আমি আস্তে-আস্তে উঠে ভুজঙ্গর বুকের উপর চেপে বসলুম। ঘুমের মধ্যে সে গোঁ-গোঁ ক'রে উঠলো। তারপর দু'হাতে তার গলা টিপে ধরলুম শক্ত ক'রে। আমার গায়ে যত শক্তি আছে সব নেমে এসে ভর করলো আমার দশটি আঙুলে। বড়ো-বড়ো বিকট চোখ মেলে সে তাকালো—সে কি ঐ অন্ধকারেও আমাকে চিনতে পেরেছিলো? পেরেছিলো নিশ্চয়ই। তখন তার মুখে যন্ত্রণায় আতঙ্কে ঘৃণায় অভিযোগে মেশা যে ভীষণ ভাব ফুটে উঠেছিলো তা আমি নরকে গিয়েও ভুলবো না।

'অনেকক্ষণ সে গোঁ-গোঁ করলো, ধ্বস্তাধ্বস্তি করার চেষ্টা করলো, কিন্তু আমার দশটি আঙুলের একটিও মুহূর্তের জন্য

শিথিল হ'লো না। তারপর আস্তে-আস্তে তার ছটফটানি ক'মে এলো—খানিক পরে হঠাৎ একটা গভীর ভীষণ দীর্ঘশ্বাস পড়লো—তারপর চুপ।

'তখন আমি উঠে আলো জ্বালালুম। এতদিন নিজের মুখ যা দিয়ে কুৎসিত ক'রে রেখেছি, সেই সব দিয়ে সাজালুম ওর মুখ। সেই দাড়ি, সেই আঁচিল, সেই কানা চোখ, সেই লম্বা-লম্বা আলুথালু চুল। কাজটি শেষ করতে পুরো একটি ঘণ্টা লাগলো। নিপুণ শিল্পীর হাতে আঁকা হ'লো ওর মুখ—গোবিন্দ চাটুজ্যের মুখ—কোনোখানে খুঁত নেই। তারপর আমার এই হেঁটো ধুতি আর খাটো পাঞ্জাবি ওকে পরালুম—আমি পরলুম ওর জামা-কাপড়।

'মৃত গোবিন্দ চাটুজ্যে প'ড়ে রইলো ঘরে, জীবন্ত ভুজঙ্গধর নিচে নেমে এসে কলতলায় হাত-মুখ ধুলো, তারপর রাস্তায়। ওকে রেখে এলুম মেঝেতে শুইয়ে যতদূর সম্ভব বীভৎস ভঙ্গিতে, বিছানাটা এক কোণে গুটিয়ে রাখলুম, তার মধ্যে রইলো আমার এতদিনের অদ্ভুত প্রসাধনের সঙ্গী দামি আয়নাটি। মুখের উপর ছবি আঁকার কাজ রাত্তিরেই করতে হ'তো, তাই আলোটা ছিলো খুব জোরালো—সেটা নেবাতে ভুলে গিয়েছিলুম, এখন মনে পড়ছে।

'আজ থেকে আমি ভুজঙ্গ, আজ থেকে আমি ভুজঙ্গ। কী আরাম, কী শান্তি।

'আমার রং তুলির পুঁটলিটা হাতে ক'রে নিয়ে বেরিয়েছিলুম, খানিকটা এসে সেটা ফেলে দিলুম একটা ডাস্টবিনে। বলতে ভুলেছি—টাকা-পয়সা সব সঙ্গে নিয়েই বেরিয়েছিলুম। ও-টাকা তো ভুজঙ্গর, আমিই তো ভুজঙ্গ। রাস্তায় ঘোরাঘুরি ক'রে রাত

কাটিয়ে দিলুম। ভোর হ'লো, লোকজনের চলাচল শুরু হ'লো। কাছাকাছি একটা ভালো হোটেলে গিয়ে উঠলুম। ডিম-রুটি দিয়ে চা খেলুম ভদ্রলোকের মতো। কতদিন পরে মানুষের মতো খাওয়া জুটলো। তারপর বেরিয়ে রাশি-রাশি জামা-কাপড়, গরম জামা, শাল, বিছানা, বালিশ, হোল্ডল, স্যুটকেস সব কিনলুম। আর তো আমি হাড়-কিপটে গোবিন্দ চাটুজ্যে নই, আমি ভুজঙ্গধর, আমি মানুষ, এখন থেকে মানুষের মতো বাঁচবো। নাপিতের দোকানে গিয়ে চুল ছাঁটালুম, দাড়ি কামালুম। হোটেলে ফিরে এসে গরম জলে ভালো ক'রে স্নান করলুম—দশ বছর পরে এই আমার প্রথম স্নান। জলের স্পর্শে সমস্ত শরীর যেন জুড়িয়ে গেলো। আহা—যে-কোনো অভাজন যে-সব সুখ থেকে বঞ্চিত নয়, আমি তা থেকে এতদিন বঞ্চিত ছিলুম কোন প্রাণে! কিন্তু আর না—আর না—গোবিন্দ চাটুজ্যে ম'রে গেছে, আমি ভুজঙ্গধর, আজ থেকে আমার মানুষের মতো জীবন যাপন। জিনিসপত্র নিয়ে একটা রিকশ ক'রে গেলুম শেয়ালদা ষ্টেশনে, সেখান থেকে আর একটা রিকশ নিয়ে এই মেস-এ।

'এখানে আবার না এলেই হ'তো, ষ্টেশনে গিয়ে রেলগাড়ি ধ'রে যে-কোনো জায়গায় চ'লে গেলেই হ'তো। কিন্তু এলুম কেন জানেন? আমি যে গোবিন্দ চাটুজ্যে নই, আমি যে ভুজঙ্গধর, সেটা নিজের কাছে এবং সকলের কাছে প্রমাণ করবার জন্যে। আজ সকালে এই মেসে ভুজঙ্গর আসবার কথা। সে এলো। সুন্দর চেহারা তার, চমৎকার ভদ্রলোক সে, পরিপাটি ফিটফাট তার সাজসজ্জা। তারপর তো আপনারা জানেন।

'ইন্সপেক্টরবাবু, আপনার কাছে আমার এই অনুরোধ আপনারা আমাকে দয়া ক'রে দ্বীপান্তরে পাঠাবেন না। আর বিচারের ব্যাপারটা যথাসম্ভব সংক্ষেপে করবেন। যদি আজই ফাঁসিকাঠে ঝুলতে পারতুম, তাহ'লে খুশি হতুম। বাঁচবার শেষ চেষ্টা করলুম, তা ব্যর্থ হ'লো, এখন আর আমার বাঁচবার ইচ্ছে নেই। এখন আমি মরলেই বাঁচি।···আচ্ছা ইন্সপেক্টর বাবু, ফাঁসিতে খুব কি লাগে?'

শেষ

